কর, তবে (এমনিভাবে তোমাদেরকেও একদিন দুর্ভোগ পোহাতে হবে। সেই দুর্ভোগের দিন সামনে আছে। অতএব তোমরা) সেই দিন (অর্থাৎ সেই দিনের বিপদ) থেকে কিরূপে আত্মরক্ষা করবে, যা (ভয়াবহতা দৈর্ঘ্যের কারণে) বালককে করে দিবে বৃদ্ধ! সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (এটা টলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই)। এটা (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়বস্তু) একটা (সারগর্ভ) উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার দিকে রাস্তা অবলম্বন করুক। (অর্থাৎ তাঁর কাছে পৌঁছার জন্য ধর্মের পথ অবলম্বন করুক। অতঃপর সূরার শুরুতে বর্ণিত রাত্রির ইবাদত ফরয হওয়ার আদেশ রহিত করা হচ্ছে ঃ) আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবং আপনার কতক সহচর (কখনও) রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, (কখনও) আর্ধাংশ এবং (কখনও) এক-তৃতীয়াংশ (নামাযে) দণ্ডায়মান হন। দিবা ও রাত্রির পূর্ণ পরিমাপ আল্লাহ্ তা'আলাই করতে পারেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। (ফলে তোমরা খুবই কষ্ট ভোগ কর। কেননা, অনুমান করলে কম হওয়া সন্দেহ থাকে এবং অনুমানের চেয়ে বেশী করলে সারারাত্রি ব্যয়িত হয়ে যায়। উভয় বিষয়ে আত্মিক ও দৈহিক কষ্ট আছে)। অতএব (এসব কারণে) তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং পূর্ববর্তী আদেশ রহিত করে দিয়েছেন। কাজেই (এখন) কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু পাঠ কর। (এখানে কোরআন পাঠ করার অর্থ তাহাজ্জুদ পড়া। কারণ, এতে কোরআন পাঠ করা হয়। এই আদেশ মোস্তাহাব বিধান প্রমাণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদ পড়া আর ফরয নয়। এই আদেশ রহিত। এখন যতক্ষণ পার মোস্তাহাব হিসাবে ইচ্ছা করলে পড়ে নাও। রহিত হওয়ার আসল কারণ কষ্ট। عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ থেকে তা বোঝা যায়।

পূর্ববত বিষয়বস্তু এর ভূমিকা। অতঃপর রহিত করণের দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হচ্ছে ঃ) তিনি (আরও) জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ জীবিকা অন্বেষণে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। (এসব অবস্থায় নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া কঠিন। তাই আদেশ রহিত করা হয়েছে। কাজেই এ কারণেও অনুমতি আছে যে) কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ কর। (তাহাজ্জুদ রহিত হয়ে গেলেও এই আদেশ এখনও বহাল আছে যে) তোমরা (ফরয) নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম (অর্থাৎ আন্তরিকতাপূর্ণ) ঋণ দাও। তোমরা যে সৎ কর্ম নিজেদের জন্য অগ্রে (পরকালের পুঁজি করে) পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তমরূপে গচ্ছিত থাকবে এবং পুরস্কার হিসাবে বর্ধিতরূপে পাবে। (অর্থাৎ সাংসারিক কাজে ব্যয় করলে যে প্রতিদান ও উপকার পাওয়া যায়, সৎ কাজে ব্যয় করলে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে)। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ক্ষমা প্রার্থনা করাও বহাল নির্দেশাবলীর অন্যতম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مزمل ـ يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ এবং পরবর্তী সূরায় ব্যবহৃত مدثر শব্দদ্বয়ের অর্থ

প্রায় এক অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত। উভয় সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব করছিলেন এবং বস্ত্রাবৃত হয়েছিলেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরিগুহায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে ইক্‌রা সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত খাদিজা (রা)-র নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন ঃ زملونی ، زملونی অর্থাৎ 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও।' এর পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে 'ফতরাতুল ওহী' বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন ঃ একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একস্থানে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম ঃ আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আয়াত নাযিল হল। এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপের বর্ণনানুযায়ী এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণা ও অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।---(রূহুল মা'আনী) এই বিশেষ ভঙ্গিতে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে এবং এর কিছু বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

তাহাজ্জুদ নামাযের বিধানাবলী ঃ مدثر ও مزمل শব্দদ্বয় থেকেই বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কোরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঞ্জেগানা নামায ফরয ছিল না। পাঞ্জেগানা নামায মে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখের হাদীসদৃষ্টে ইমাম বগভী (র) বলেন ঃ এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ রাত্রির নামায রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সমগ্র উম্মতের উপর ফরয ছিল। এটা পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার পূর্বের কথা।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায কেবল ফরযই করা হয়নি বরং তাতে রাত্রির কম-পক্ষে এক-চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। কারণ আয়াতের মূল আদেশ

হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকা। কিছু অংশ বাদ দেওয়ার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম বগভী (র) বলেন ঃ এই আদেশ পালনার্থে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যয় করতেন। ফলে তাঁদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাযে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ নামায পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায পড়াই তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট। এই বিষয়বস্তু আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মে'রাজের রাত্রিতে পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজ্জুদ সুন্নত থেকে যায়। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সা) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। ---(মাযহারী)

قُمِ اللَّيْلَ — اللَّيْلَ শব্দের সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত হওয়ার অর্থ হয়েছে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ আপনি সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ অর্থাৎ এখন আপনি অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী নামাযে মশগুল হোন। এটা إِلَّا قَلِيلًا ব্যতিক্রমের বর্ণনা। তাই প্রশ্ন হয় যে, অর্ধেক রাত্রি তো কিছু অংশ হতে পারে না। জওয়াব এই যে, রাত্রির প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও ইশার নামায ইত্যাদিতে অতিবাহিতই হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাত্রির অর্ধেক। সেটা সারা রাত্রির তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরাত্রির কমেরও অনুমতি আছে, বেশীরও আছে। তাই সমষ্টিগতভাবে এর সারমর্ম এই যে, কম-পক্ষে এক-চতুর্থাংশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশী নামাযে মশগুল থাকা ফরয।

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ এর অর্থ ঃ تَرْتِيل-এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা।---(মুফরাদাত) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দ্রুত কোরআন তিলাওয়াত করবেন না বরং সহজভাবে এবং অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে উচ্চারণ করবেন।---(কুরতুবী) وَرَتِّلِ বলে রাত্রির নামাযে করণীয় কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামায কেরাআত, তসবীহ, রুকু, সিজদা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কোরআন পাঠ। একারণেই সহীহ হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদের নামায অনেক লম্বা করে আদায় করতেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল কোরআন পাঠই কাম্য নয় বরং তরতীল তথা সহজ ও সঠিকভাবে পাঠ কাম্য। রসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবেই পাঠ করতেন। রাত্রির নামাযে তিনি কিরূপে কোরআন তিলাওয়াত করতেন, এই প্রশ্নের জওয়াবে হযরত উম্মে সালমা (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিরাআত অনুকরণ করে শোনান তাতে প্রত্যেকটি হরফ স্পষ্ট ছিল।---(মাযহারী)

যথা সম্ভব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও তরতীলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করেন, তাঁর কিরা'আতের মত অন্য কারও কিরা'আত আল্লাহ্ তা'আলা শুনেন না।---(মাযহারী)

হযরত আলকামা (রা) এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে তিলাওয়াত করতে দেখে বললেনঃ لقد رتل القران فدا ٤ ابى و امى ---অর্থাৎ সে কোরআন তরতীল করেছে; আমার পিতামাতা তারজন্য উৎসর্গ হোন।--(কুরতুবী)

তবে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তরতীল। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا আয়াতে যে তরতীলের আদেশ করেছেন, এটাই সেই তরতীল।---(কুরতুবী)

قول ثقيل—اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (ভারী কালাম) বলে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন বর্ণিত হালাল, হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের সীমা স্থায়ীভাবে মেনে চলা স্বভাবত ভারী ও কঠিন। তবে যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সহজ করে দেন, তার কথা স্বতন্ত্র। কোরআনকে ভারী বলার আরেক কারণ এই যে, কোরআন নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষ ওজন ও তীব্রতা অনুভব করতেন। ফলে প্রচণ্ড শীতেও তাঁর মস্তক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তিনি তখন কোন উটের উপর সওয়ার থাকলে বোঝার কারণে উট নুয়ে পড়ত।---(বুখারী)

এই আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষকে কষ্টে অভ্যস্ত করার জন্য তাহাজ্জুদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। রাত্রিকালে নিদ্রার প্রাবল্য এবং মানসিক সুখের বিরুদ্ধে এটা একটা জিহাদ। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোরআন অবতীর্ণ কষ্টসাধ্য ও ভারী বিধি বিধান সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে।

نَاشِئَةٌ—اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ শব্দটি ধাতু। এর অর্থ রাত্রির নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রার পর নামাযের জন্য গাত্রোত্থান করা। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। কারণ, এর শাব্দিক অর্থও রাত্রিতে নিদ্রার পর উঠে নামায পড়া। ইবনে কায়সান (রা) বলেন ঃ শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করাকে نَاشِئَةُ اللَّيْلِ বলা হয়। ইবনে যায়েদ (রা) বলেন ঃ রাত্রির যে অংশতে কোন নামায পড়া হয়, তা نَاشِئَةُ اللَّيْلِ এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবী মুলায়কা (রা) এক প্রশ্নের জওয়াবে হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের (রা)ও তাই বলেছেন।—(মাযহারী)

এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাত্রির যে কোন অংশে যে নামায পড়া হয়, বিশেষত ইশার পর যে নামায পড়া হয়, তাই قِيَامُ اللَّيْلِ ও نَاشِئَةُ اللَّيْلِ-এর মধ্যে দাখিল, যেমন হাসান বসরী (র) বলেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা), সাহাবায়ে কিরাম, তাঁবেয়ীন ও বুযুর্গগণ সর্বদাই এই নামায নিদ্রার পর শেষরাত্রে জাগ্রত হয়ে পড়তেন। তাই এটা উত্তম ও অধিক বরকতের কারণ। তবে ইশার নামাযের পর যে কোন নফল নামায পড়া যায়, তাতে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

وَطْأً—هِيَ اَشَدُّ وَطْأً শব্দে দুরকম কিরা'আত আছে। প্রসিদ্ধ কিরা'আতে ওয়াও এর উপর যবর এবং ত্বোয়া সাকিন করে অর্থ দলন করা, পিষ্ট করা। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির নামায প্রবৃত্তি দলনে খুবই সহায়ক অর্থাৎ এতে করে প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং অবৈধ বাসনা থেকে বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই কিরা'আত অবলম্বন করা হয়েছে। দ্বিতীয় কিরা'আত হচ্ছে كِتَاب-এর ওজনে وِطَاء-এমতাবস্থায় এটা অনুকূল হওয়ার অর্থে ধাতু। لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ আয়াতেও শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যায়েদ (রা) থেকে এই অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ (রা) বলেনঃ উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে নামাযের জন্য গাত্রোত্থান করা অন্তর, দৃষ্টি, কর্ণ ও জিহবার মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ اَشَدُّ وَطْأً-এর অর্থ এই যে, কর্ণ ও অন্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাত্মতা থাকে। কারণ, রাত্রিবেলায় সাধারণত কাজকর্ম ও হট্টগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, কর্ণও তা শুনে ও অন্তরও উপস্থিত থাকে।

اَقْوَم- শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। অর্থাৎ রাত্রিবেলায় কোরআন তিলাওয়াত

অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয় না।

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এই আয়াতেও তাহাজ্জুদের রহস্য বর্ণিত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিজ সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত ও রহস্যটি সমস্ত উম্মতের জন্য ব্যাপক।

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا—سبح শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাফেরা করা। এ কারণেই সাঁতার কাটাকেও سباحة ও سبح বলা হয়। এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা, শিক্ষা দেওয়া, প্রচার করা, মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত অথবা নিজের জীবিকার অন্বেষণে ঘোরাফেরা করা ইত্যাদি সবই এতে দাখিল।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের তৃতীয় রহস্য ও উপযোগিতা বর্ণিত হয়েছে। এটাও সবার জন্য ব্যাপক। রহস্য এই যে, দিবাভাগে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও অন্য সবাইকে অনেক কর্মব্যস্ততায় থাকতে হয়। ফলে একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাত্রি একাজের জন্য থাকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিদ্রা ও আরাম এবং তাহাজ্জুদের ইবাদতও হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য ঃ ফিকাহ্‌বিদগণ বলেন ঃ যে সব আলিম ও মাশায়েখ জনগণের শিক্ষাদীক্ষা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদেরও এ কাজ দিবাভাগে সীমিত রেখে রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত ও ইবাদতে মশগুল হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণের কর্মপদ্ধতি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে যদি কোন সময় রাত্রিবেলায়ও উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক ব্যতিক্রম হতে পারে। এর সাক্ষ্য ও অনেক আলিম ও ফিকাহ্‌বিদের কর্ম থেকে পাওয়া যায়।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا—تبتل-এর শাব্দিক অর্থ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাযের আদেশ দেওয়ার পর এই আয়াতে এমন এক ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা রাত্রি অথবা দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় বরং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা, একথা কল্পনাও করা যায় না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন না, তাই এ আদেশ করা হয়েছে।---(মাযহারী) আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিবারাত্রি সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; এতে কোন সময় অবহেলা ও অনবধানতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এটা তখনই হতে পারে, যখন স্মরণ করার অর্থ ব্যাপক নেওয়া হয় অর্থাৎ মুখে, অন্তরে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে ব্যাপৃত রেখে ইত্যাদি যে কোন প্রকারে স্মরণ করা। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ كان يذكر الله على كل حين অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন। এটাও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে শুদ্ধ হতে পারে। কেননা, প্রস্রাব-পায়খানার সময় তিনি যে মুখে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন না, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তবে আন্তরিক স্মরণ সর্বাবস্থায় হতে পারে। আন্তরিক স্মরণ দুই প্রকার--১. শব্দ কল্পনা করে স্মরণ করা এবং ২. আল্লাহ্‌র গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।---(মাওলানা থানভী)

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় আদেশ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا—অর্থাৎ আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানে ও ইবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে ইবাদতে শিরক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল। হযরত ইবনে যায়েদ (রা) বলেন ঃ تبتل -এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা।---(মাযহারী) কিন্তু এই تبتل তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رهبانيت তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে لا رهبانية فى الاسلام বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, শরীয়তের পরিভাষায় رهبانية-এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে ইবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস থাকা যে, এসব হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে না, অথবা ওয়াজিব হকে ত্রুটি করে কার্যত সম্পর্কচ্ছেদ করা। আর এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের উপর কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেওয়া। এ ধরনের সম্পর্ক-চ্ছেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থী নয়; বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। পয়গম্বরগণের সুন্নত; বিশেষত পয়গম্বরকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মোস্তাফা (সা)-র সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে تبتل শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীনের ভাষায় এরই অপর নাম 'ইখ্‌লাস'।---(মাযহারী)

জ্ঞাতব্য ঃ অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং সাংসারিক সম্পর্ক ত্যাগ করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সূফী বুযুর্গগণ সবার অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা বলেন ঃ

আমরা যে দূরত্ব অতিক্রম করার কাজে দিবারাত্রি মশগুল আছি, প্রকৃতপক্ষে তার দু'টি স্তর আছে—প্রথম স্তর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা। উভয় স্তর পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোচ্য আয়াতে এ দু'টি স্তরই পর পর দুই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ১. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ এবং ২. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

এখানে আল্লাহ্কে স্মরণ করার অর্থ সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণ করা, যাতে কখনও ত্রুটি ও শৈথিল্য দেখা না দেয়। এই স্তরকেই সূফী-বুযুর্গগণের পরিভাষায় وصول الى الله আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা বলা হয়। এভাবে প্রথম বাক্যে শেষ স্তর এবং শেষ বাক্যে প্রথম স্তর উল্লিখিত হয়েছে। এই ক্রম পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত এই যে, দ্বিতীয় স্তরই আল্লাহ্র পথের পথিকের আসল উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। তাই এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করার জন্য স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। শেখ সাদী (র) উপরোক্ত দু'টি স্তর চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

تعلق حجاب است و بے حاصلی — چو پوند ها بگسلی واصلی

ইসমে যাতের যিকর অর্থাৎ বারবার 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' বলাও ইবাদত ঃ আয়াতে ইসম শব্দ উল্লেখ করে وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ বলা হয়েছে এবং وَاذْكُرْ رَبَّكَ বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসমে অর্থাৎ আল্লাহ্ বারবার উচ্চারণ করাও আদিষ্ট বিষয় ও কাম্য।---(মাযহারী) কোন কোন আলিম একে বিদ'আত বলেছেন। আয়াত থেকে জানা গল যে, তাদের এই উক্তি ঠিক নয়।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا---যাকে কোন কাজ সোপর্দ করা হয়, অভিধানে তাকে وكيل বলা হয়। কাজেই فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ কর। পরিভাষায় একেই তাওয়াক্কুল বলা হয়। এই সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম ইয়াকুব কারখী (র) বলেন ঃ সূরার শুরু থেকে এই আয়াত পর্যন্ত সুলুক তথা আল্লাহ্র পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে ১. রাত্রিবেলায় আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্জনে গমন, ২. কোরআন পাকে মশগুল হওয়া, ৩. সদা-সর্বদা আল্লাহ্র স্মরণ ৪. সৃষ্টির সাথে সম্পর্কছেদ এবং ৫. তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সর্বশেষ নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার গুণ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালন-কর্তা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগা গোড়া পূর্ণ করার যিম্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন এবং তার উপর যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে কখনও বঞ্চিত হবে না। কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছে ঃ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার যাবতীয় প্রয়োজনাদি ও বিপদাপদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

তাওয়াক্কুলের শরীয়তসম্মত অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করার অর্থ এরূপ নয় যে, জীবিকা উপার্জন ও আত্মরক্ষার যেসব উপকরণ ও হাতিয়ার আল্লাহ্‌ তা'আলা দান করেছেন, সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে হবে। বরং তাওয়াক্কুলের স্বরূপ এই যে, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উপকরণাদি পুরোপুরি ব্যবহার কর, কিন্তু বৈষয়িক উপকরণাদিতে অতিমাত্রায় মগ্ন হয়ে যেও না। ইচ্ছাধীন কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর ফলাফল আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

তাওয়াক্কুলের এই অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বগভী ও বায়হাকী (র) বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ

ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاتقوا الله واجملوا فى الطلب অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তখন পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হবে না, যে পর্যন্ত সে তার অবধারিত ও লিখিত রিযিক পুরোপুরি হাসিল না করে। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে এতদূর মগ্ন হয়ো না যে, অন্তরের সমস্ত অভিনিবেশ বৈষয়িক উপকরণাদির মধ্যেই সীমিত থেকে যায় এবং তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।---(মাযহারী) তিরমিযীতে আবূ যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ দুনিয়া ত্যাগ এর নাম নয় যে, তোমরা হালালকৃত বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য হারাম করে নেবে অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ অযথা উড়িয়ে দেবে; বরং দুনিয়া ত্যাগের অর্থ এই যে, তোমাদের কাছে যা আছে, তার তুলনায় আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তার উপর তোমাদের ভরসা বেশী হবে।---(মাযহারী)

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ---ইমাম কারখী (র)-র উক্তিমতে এটা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে প্রদত্ত ষষ্ঠ নির্দেশ। অর্থাৎ মানুষের উৎপীড়ন ও গালিগালাজে সবর করা। এটা আল্লাহ্‌র পথের পথিকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। উদ্দেশ্য এই যে, যাদের শুভেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সাধক তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন নিয়োজিত করে, প্রতিদানে তাদের পক্ষ থেকেই নির্যাতন ও গালিগালাজ শুনে উত্তম সবর করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের

কল্পনাও করবে না। সূফীগণের পরিভাষায় এই সর্বোচ্চ স্তর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا — وَاهْجُرْ---এর শাব্দিক অর্থ বিষণ্ণ ও দুঃখিত মনে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। অর্থাৎ মিথ্যারোপকারী কাফিররা আপনাকে যেসব পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নেবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় মানুষের অভ্যাস এই যে, যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা হয়, তাকে গালমন্দ দেয়। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্পর্ক ত্যাগের আদেশ দিতে যেয়ে هَجْرًا جَمِيلًا শব্দ যোগ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনার উচ্চ পদমর্যাদার খাতিরে আপনি কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন এবং মুখেও তাদেরকে মন্দ বলবেন না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ পরবর্তীতে অবতীর্ণ জিহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তা করলে এরূপ বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের উৎপীড়নের কারণে সবর ও সম্পর্ক ত্যাগ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা হুমকি, শাস্তি ও জিহাদের পরিপন্থী নয়। এই আয়াতের নির্দেশ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং জিহাদে যে শাস্তির হুমকি আছে তার আদেশ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামী জিহাদ কোন প্রতিশোধ স্পৃহা ও ক্রোধবশত করা হয় না, যা সবর ও উত্তম সম্পর্ক ত্যাগের পরিপন্থী হবে। বরং জিহাদ বিশেষ আল্লাহ্র আদেশ প্রতিপালন মাত্র। সাধারণ অবস্থায় সবর ও সম্পর্ক ত্যাগও তেমনি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য কাফিরদের পরকালীন আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী অত্যাচার-অবিচারের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন। তবে বিশেষ রহস্যের তাগিদে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী আয়াত ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ

أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا---এর মর্ম তাই। এতে কাফিরদেরকে أولى النعمة বলা হয়েছে। نعمة শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া পরকাল অবিশ্বাসীরই কাজ হতে পারে। মু'মিনও মাঝে মাঝে এগুলো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তাতে মত্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না।

অতঃপর পরকালের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে انكال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা আছে--- طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ ---এর অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, গলধঃকরণও করা যায় না এবং উদ্‌গীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের খাদ্য যরী ও যাক্কুমের অবস্থা তাই হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ তাতে আগুনের ফোঁটা থাকবে ; যা গলায় আটকে যাবে।---(নাউযুবিল্লাহ্ মিনহু) শেষে বলা হয়েছে ঃ وَعَذَابًا أَلِيمًا ---নির্দিষ্ট আযাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরও অধিক কঠোরতা ও অকল্পনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের পরকাল ভীতি ঃ ইমাম আহমদ, ইবনে আবী দাউদ, ইবনে আদী ও বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি কোরআন পাকের এই আয়াত শুনে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। হযরত হাসান বসরী (র) একদিন রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় সম্মুখে খাদ্য নীত হলে অন্তরে এই আয়াতের কল্পনা জেগে উঠে। তিনি খাদ্য গ্রহণ করতে পারলেন না। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আবার এই ঘটনা ঘটল। তিনি আবার খাদ্য ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন তিনি খাদ্য গ্রহণ করলেন না, তখন তাঁর পুত্র হযরত সাবেত বানানী, ইয়াযীদ যব্বী ও ইয়াহ্‌ইয়া বাক্কা (র)-র কাছে যেয়ে পিতার অবস্থা জানালেন। তাঁরা এসে বহু পীড়াপীড়ির পর তাঁকে সামান্য খাদ্য গ্রহণে সম্মত করলেন। ---(রূহুল মা'আনী)

অতঃপর কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ঃ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ---এরপর কাফিরদের ফিরাউন ও হযরত মূসার কাহিনী শুনিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ফিরাউন পয়গম্বর মূসা (আ)-কে মিথ্যারোপ করে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, তোমরা মিথ্যারোপ অব্যাহত রাখলে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে এমনি ধরনের আযাব আসতে পারে। শেষে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে এরূপ আযাব না আসলেও কিয়ামতের সেই দিনের আযাবকে ঠেকাতে পারবে না, যেদিন ভয়াবহ ও দীর্ঘ হওয়ার কারণে বালককে বৃদ্ধে পরিণত করে দেবে। বাহ্যত এতে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও কঠোরতা বিধৃত হয়েছে। সেদিন এমন ভীতি ও ত্রাস দেখা দেবে যে, বালকও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ একে উপমা বলেছেন এবং কারও মতে এটা বাস্তব সত্য। দিনটি এত দীর্ঘ হবে যে, বালকও বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে।---(কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

তাহাজ্জুদ আর ফরয নয় ঃ সূরার শুরুতে قُمِ اللَّيْلَ বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও

সকল মুসলমানের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই নামায অর্ধরাত্রির কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর একদল সাহাবী প্রায়ই রাত্রির অধিকাংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করে এই ফরয আদায় করতেন। প্রতি রাত্রিতেই এই ইবাদত এবং দিনের বেলায় দীনের দাওয়াত ও প্রচারকার্য, তদুপরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই মেহনতমজুরী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। নিয়মিতভাবে এই দীর্ঘ নামায আদায় করতে করতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের পদযুগল ফুলে যায়। তাঁদের এই কষ্ট ও শ্রম আল্লাহ্ তা'আলার অগোচরে ছিল না। কিন্তু তাঁর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল যে, এই পরিশ্রম ও মেহনতের ইবাদত ক্ষণস্থায়ী হবে, যাতে তাঁরা পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে যান। এর প্রতি إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا আয়াতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ এর চেয়ে ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী কোরআনের দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হবে, তাই আপনাকে এই কষ্ট ও পরিশ্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহ্র জ্ঞান অনুযায়ী যখন এই সাধনা ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে দেওয়া হল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেবল দীর্ঘ নামায রহিত হয়েছে এবং আসল তাহাজ্জুদের নামায পূর্ববৎ ফরয রয়ে গেছে। অতঃপর মি'রাজের রাত্রিতে যখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয করা হল, তখন তাহাজ্জুদের নামায আর ফরয রইল না।

বাহ্যত রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সমস্ত উম্মত থেকে এই রহিত ফরয হয়ে গেছে। তবে তাহাজ্জুদের নামায মোস্তাহাব এবং আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয়---এই বিধান এখনও বাকী আছে। এখন এই নামাযে কোন সময়সীমা এবং কোরআন পাঠের কোন বাঁধা-ধরা পরিমাণ রাখা হয়নি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি ও ফুরসত অনুযায়ী পড়তে পারে এবং যতটুকু সম্ভব কোরআন পাঠ করতে পারে।

শরীয়তের বিধান রহিত হওয়ার স্বরূপ ঃ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে তাদের আইন-কানুন পরিবর্তন ও রহিত করে থাকে। তবে এর বেশীর ভাগ কারণ, অভিজ্ঞতার পর নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে, যা পূর্বে জানা থাকে না। নতুন পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে প্রথম আইন রহিত করে অন্য আইন জারি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলীতে এরূপ কল্পনাও করা যায় না। কেননা, কোন নতুন বিধান জারি করার পর মানুষের কি অবস্থা দাঁড়াবে, কেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন। তাঁর সর্বব্যাপী ও চিরন্তন জ্ঞানের বাইরে কোন কিছু নেই। কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে কোন কোন বিধান আল্লাহ্র জ্ঞানে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জারি করা হয় এবং তা কারও কাছে প্রকাশ করা হয় না। ফলে মানুষ মনে করে যে, এই বিধান চিরকালের জন্য স্থায়ী। আল্লাহ্র কাছে নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন বিধানটি প্রত্যাহার করা হয়, তখন মানুষের দৃষ্টিতে তা রহিতকরণ বলে প্রতিভাত হয়। অথচ

প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা মানুষের কাছে একথা বর্ণনা করা ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে, বিধানটি চিরকালের জন্য নয়; বরং এই মেয়াদের জন্যই জারি করা হয়েছিল। এখন মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিধানও শেষ হয়ে গেছে।

কোরআন পাকের অনেক আয়াত রহিত হতে দেখে সাধারণভাবে যে সন্দেহ উত্থাপন করা হয়, উপরোক্ত বক্তব্যে তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল। তাঁরা সূরা বনী ইসরাঈলের وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ আয়াত-খানি এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। এতে বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দায়িত্বে তাহাজ্জুদের নামাযকে একটি অতিরিক্ত ফরয হিসাবে আরোপ করা হয়েছে। কেননা, نَافِلَةً শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত; মানে অতিরিক্ত ফরয। কিন্তু অধিকাংশের মতে এই নামায এখন কারও উপর ফরয নয়। তবে মোস্তাহাব সবার জন্যই। আয়াতে نَافِلَةً لَّكَ বলে পারিভাষিক নফল বোঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট আলোচনা সূরা বনী ইসরাঈলের তফসীরে দেখুন।

ফরয তাহাজ্জুদ রহিতকারী فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ থেকে إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ পর্যন্ত আয়াতখানি সূরার শুরুভাগের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার এক বছর অথবা আট মাস পর অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব পূর্ণ এক বছর পর ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। মসনদে আহমদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরার শুরুতে তাহাজ্জুদের নামায ফরয করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এক বছর পর্যন্ত এই আদেশ পালন করতে থাকেন। সূরার শেষ অংশ বার মাস পর্যন্ত আকাশে আটকে রাখা হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার পর শেষ অংশ অবতীর্ণ হয় এবং তাতে ফরয তাহাজ্জুদ রহিত করে দেওয়া হয়। এরপর তাহাজ্জুদের নামায নিছক নফল ও মোস্তাহাব থেকে যায়।---(রূহুল মা'আনী)

এর পর রহিতকরণের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ عَلِمَ أَنْ لَّنْ تُحْصُوهُ

احصاء শব্দের অর্থ গণনা করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা করতে পারবে না। কোন কোন তফসীরবিদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে এই নামাযে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। কেননা, তখনকার দিনে সময় জানার যন্ত্র ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। থাকলেও নামাযে মশগুল হয়ে বারবার ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁদের অবস্থা ও

খুণ্ড-খুযুর পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিল না। আবার কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে احصاء শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যহ যথারীতি নামায পড়তে সক্ষম না হওয়া। শব্দটি এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন হাদীসে আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ من احصاها دخل الجنة অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামসমূহকে কর্মের ভেতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে। সূরা ইবরাহীমের তফসীরেও এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

تَابَ عَلَيْكُمْ—فَتَابَ শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তওবাকেও এ কারণে তওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশেষে বলা হয়েছে ঃ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

---অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায, যা এখন ফরযের পরিবর্তে মোস্তাহাব অথবা সুন্নত রয়ে গেছে, তাতে যে যতটুকু কোরআন সহজে পাঠ করতে পারে, পাঠ করুক। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ---এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, ফরয নামায পাঁচটি যা মি'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায এক বছর পর্যন্ত ফরয থাকাকালেই মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর পূর্বোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। সুতরাং সূরার শেষের اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আয়াতে পাঞ্জেগানা ফরয নামায বোঝানো যেতে পারে।---(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত)

এমনি ভাবে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ বাক্যে ফরয যাকাত বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এবং এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু ইবনে কাসীর বলেন ঃ যাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরয হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে।---রূহুল-মা'আনীও তাই বলেছে।

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا---আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা

হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহ্‌কে ঋণ দিচ্ছে। এতে তার অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের দিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ধনীদের সেরা ধনী, তাঁকে দেওয়া ঋণ কখনও মারা যাবে না---অবশ্যই পরিশোধিত হবে। ফরয যাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে; যেমন আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনকে কিছু দেওয়া, মেহমানদের জন্য ব্যয় করা, আলিম ও সাধু পুরুষদের সেবাযত্ন করা ইত্যাদি। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কাজেই أَقْرِضُوا اللَّهَ বাক্যে এসব ওয়াজিব পাওনা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ——অর্থাৎ তোমরা জীবদ্দশায় যে যে কাজ সম্পাদন কর, তা মৃত্যুর সময় সেই কাজের ওসীয়্যত করে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ, মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা স্বাধীন; তারা ওসীয়্যত পূর্ণ করতেও পারে, না-ও করতে পারে। এতে আর্থিক-ইবাদত, সদকা-খয়রাতসহ নামায-রোযা ইত্যাদিও দাখিল।

হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে নিজের ধনসম্পদের তুলনায় ওয়ারিশের ধনসম্পদকে বেশী ভালবাসে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ নিজের ধনের চেয়ে ওয়ারিশের ধনকে বেশী ভালবাসে এরূপ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ খুব বুঝেশুনে উত্তর দাও। সাহাবায়ে কিরাম বললেন ঃ এই উত্তর ছাড়া আমাদের অন্য কোন উত্তর জানা নেই। তিনি বললেন ঃ (আচ্ছা, তা হলে বুঝে নাও) তোমার ধন তাই, যা তুমি স্বহস্তে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে। তোমার মৃত্যুর পর যে ধন থেকে যাবে, তা তোমার ধন নয়---তোমার ওয়ারিশের ধন। ---(ইবনে কাসীর)

سورة المدثر

সূরা মুদ্দাস্‌সির

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৬ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧ فَاِذَا نُقِرَ
فِي النَّاقُوْرِ ۝٨ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۝٩ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ
يَسِيْرٍ ۝١٠ ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۝١١ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۝١٢
وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۝١٣ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۝١٤ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۝١٥
كَلَّا ۭ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ۝١٦ سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ۝١٧ اِنَّهٗ
فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝١٨ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝١٩ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝٢٠ ثُمَّ نَظَرَ ۝٢١
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝٢٢ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝٢٣ فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ
يُّؤْثَرُ ۝٢٤ اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝٢٥ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ۝٢٦ وَمَآ
اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ۝٢٧ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ۝٢٨ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۝٢٩ عَلَيْهَا
تِسْعَةَ عَشَرَ ۝٣٠ وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا
عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ

أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ
مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى
لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ اِنَّهَا
لَاِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ
اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾ فِيْ جَنّٰتٍ
يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوْا
لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوْضُ
مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾ حَتّٰٓى اَتٰىنَا
الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ
التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ
يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۚ بَلْ لَّا
يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾ وَمَا
يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হে চাদরাবৃত, (২) উঠুন, সতর্ক করুন, (৩) আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন (৪) আপন পোশাক পবিত্র করুন (৫) এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৬) অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দেবেন না। (৭) এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে সবর করুন। (৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে; (৯) সেদিন হবে কঠিন দিন, (১০) কাফিরদের জন্য এটা সহজ নয়। (১১) যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। (১২) আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছি (১৩) এবং সদাসংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি, (১৪) এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। (১৫) এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দিই (১৬) কখনই নয়। সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (১৭) আমি সত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ

করাব। (১৮) সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে, (১৯) ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে, (২০) আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে। (২১) সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে, (২২) অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, (২৩) অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে, (২৪) এরপর বলেছে ঃ এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নয়, (২৫) এ তো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (২৬) আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। (২৭) আপনি কি বুঝলেন অগ্নি কি? (২৮) এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না (২৯) মানুষকে দগ্ধ করবে। (৩০) এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশজন ফেরেশতা। (৩১) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফিরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তাদের এই সংখ্যা করেছি---যাতে কিতাবীরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মু'মিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফিররা বলে যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (৩২) কখনই নয়। চন্দ্রের শপথ, (৩৩) শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, (৩৪) শপথ প্রভাতকালের, যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়, (৩৫) নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম, (৩৬) মানুষের জন্য সতর্ককারী (৩৭) তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; (৩৯) কিন্তু ডানদিকস্থরা, (৪০) তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে (৪২) বলবে ঃ তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? (৪৩) তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়তাম না, (৪৪) অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, (৪৫) আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম (৪৬) এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম (৪৭) আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। (৪৮) অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (৪৯) তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? (৫০) যেন তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গর্দভ (৫১) হট্টগোলের কারণে পলায়নপর। (৫২) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক। (৫৩) কখনও না বরং তারা পরকালকে ভয় করে না। (৫৪) কখনও না, এটা তো উপদেশ মাত্র। (৫৫) অতএব যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক। (৫৬) তারা স্মরণ করবে না কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠুন (অর্থাৎ স্বীয় জায়গা থেকে উঠুন অথবা প্রস্তুত হোন) অতঃপর (কাফিরদেরকে) সতর্ক করুন, (যা নবুয়তের দায়িত্ব। এখানে 'সুসংবাদ প্রদান করুন' বলা হয়নি। কারণ, আয়াতটি একেবারেই নবুয়তের প্রথম দিকের। তখন দু-একজন ছাড়া কেউ মুসলমান ছিল না। ফলে সতর্ক করাই অধিক সমীচীন ছিল)। আপন পালনকর্তার

মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, (কেননা, তওহীদই তবলীগের প্রধান বিষয়বস্তু। অতঃপর নিজেরও কতিপয় জরুরী পালনীয় কর্ম, বিশ্বাস ও চরিত্রের শিক্ষা রয়েছে। কারণ, যে তবলীগ করবে, তারও আত্মসংশোধন প্রয়োজন)। আপন পোশাক পবিত্র রাখুন (এটা কর্ম সম্পর্কিত বিষয়। শুরুতে নামায ফরয ছিল না, তাই নামাযের আদেশ করা হয়নি। দ্বিতীয় এই যে) এবং প্রতিমা থেকে দূরে থাকুন [যেমন এ পর্যন্ত আছেন। এটা বিশ্বাসগত বিষয়। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের ন্যায় তওহীদে অটল থাকুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) শিরকে লিপ্ত হবেন এরূপ আশংকা ছিল না। তবুও তওহীদের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁকে এই আদেশ করা হয়েছে]। প্রতিদানে অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অন্যকে কিছু দেবেন না। [এটা চারিত্রিক বিষয়। পয়গম্বর ব্যতীত অপরের জন্য এ কাজ জায়েয হলেও অনুত্তম। সূরা রোমের আয়াত وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا এর তফসীর থেকে একথা জানা যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শান ও মর্যাদা সবার উর্ধ্বে, তাই এটা তাঁর জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে]। এবং (সতর্ককরণের কাজে নির্যাতনের সম্মুখীন হলে তজ্জন্য) আপনার পালনকর্তার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে সবর করুন। (এটা তবলীগ সম্পর্কিত বিশেষ নৈতিকতা। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতসমূহে নিজের ও অপরের চরিত্র এবং কর্ম সংশোধনের বিভিন্ন ধারা ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর সতর্ক করার পরও যারা ঈমান আনে না, তাদের জন্য এই শাস্তিবাণী রয়েছে যে) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন কাফিরদের জন্য এক ভয়াবহ দিন হবে, যা কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না। (অতঃপর কতিপয় বিশেষ কাফির সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) যাকে আমি (সন্তান ও ধন সম্পদ থেকে রিক্ত) একক সৃষ্টি করেছি (জন্মের সময় কারও ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থাকে না। এখানে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে বোঝানো হয়েছে)। তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন (আমিই তাকে বুঝে নেব)। আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছি ও সদাসংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। এরপরও (সে ঈমান এনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি বরং কুফর ও অমর্যাদার ভঙ্গিতে এই বিপুল ধনসম্পদকে সামান্য মনে করে) সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দিই। কখনও (সে বেশী দেওয়ার যোগ্য) নয়, (কেননা,) সে আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (বিরুদ্ধাচরণের সাথে যোগ্যতা কিরূপে থাকতে পারে। তবে ঢিলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেশী দিলে সেটা ভিন্ন কথা। আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে এই ব্যক্তির উন্নতি বাহ্যত বন্ধ হয়ে যায়। সে মতে এরপর তার কোন সন্তান হয়নি এবং ধনসম্পদও বাড়েনি। এ শাস্তি দুনিয়াতে আর পরকালে) তাকে সত্বরই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই) জাহান্নামের পাহাড়ে আরোহণ করাব। (তিরমিযীর হাদীসে আছে জাহান্নামে একটি পাহাড়ের নাম 'সউদ'। সত্তর বছরে এর শৃঙ্গে পৌঁছবে, এরপর সেখান থেকে নিচে পড়ে যাবে। এরপর সর্বদাই এমনিভাবে আরোহণ করবে এবং নিচে পতিত হবে। উল্লিখিত হঠকারিতাই এই শাস্তির কারণ। অতঃপর এর আরও কিছু বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ) সে চিন্তা করেছে (যে কোরআন সম্পর্কে কি বলা যায়) অতঃপর (চিন্তা করে) মনস্থির করেছে (পরে তা বর্ণিত হবে)। ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে (এ বিষয়ে) মনস্থির করেছে। আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে (এ বিষয়ে) মনস্থির করেছে। (তীব্র নিন্দা জ্ঞাপনার্থে বারবার বিস্ময় প্রকাশ করা

হয়েছে)। অতঃপর সে (উপস্থিত লোকজনের প্রতি) দৃষ্টিপাত করেছে (যাতে স্থিরীকৃত কথাটি তাদের কাছে বলে) অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছে এবং মুখ বিকৃত করেছে, অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে। (আপত্তিকর বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার সময় মুখ বিকৃত করে ঘৃণা প্রকাশ করাই সাধারণ অভ্যাস)। এরপর বলেছেঃ এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নয়, এ তো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (উপরোক্ত মনস্থির করার বিষয়বস্তু এটাই। উদ্দেশ্য এই যে, এই কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম নয় বরং মানুষের কালাম, যা তিনি কোন যাদুকরের কাছ থেকে বর্ণনা করেন অথবা তিনি নিজেই এর রচয়িতা। তবে বিষয়বস্তু তাদের কাছ থেকে বর্ণিত, যারা পূর্বে নবুয়ত দাবী করত। অতঃপর এই হঠকারিতার বিস্তারিত শাস্তি উল্লেখ করা হচ্ছে। পূর্বে سَأُرْهِقُهُ বাক্যে তা সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছিল)। আমি সত্বরই তাকে জাহান্নামে দাখিল করব। আপনি কি বুঝলেন জাহান্নাম কি? এটা (এমন যে, প্রবিষ্ট ব্যক্তির কোন কিছু দগ্ধ করতে) বাকী রাখবে না এবং (কোন কাফিরকে ভিতরে না নিয়ে) ছাড়বে না। মানুষকে দগ্ধ করবে। এর উপর নিয়োজিত থাকবে উনিশ জন ফেরেশতা। তাদের একজনের নাম মালেক। তারা কাফিরদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেবে। শক্তিশালী একজন ফেরেশতাই জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও উনিশ জনকে নিয়োগ করা থেকে বোঝা যায় যে, শাস্তি দানের কাজটি খুবই গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করা হবে। উনিশ সংখ্যার গূঢ় তত্ত্ব আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে অভাজনের কাছে যা অধিক গ্রহণযোগ্য, তা এই যে, আসলে সত্য বিশ্বাস-সমূহের বিরোধিতার কারণে কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কর্ম সম্পর্কিত নয় এমন অকাট্য বিশ্বাস নয়টি ১. আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. জগতের নতুনত্বে বিশ্বাস করা, ৩. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ৪. সমস্ত ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাস রাখা, ৫. পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা, ৬. তকদীরে বিশ্বাস করা, ৭. কিয়ামতে বিশ্বাস করা। ৮. জান্নাত ও ৯. দোযখে বিশ্বাস করা। অন্যসব বিশ্বাস এগুলোর শাখা-প্রশাখা। কর্ম সম্পর্কিত অকাট্য বিশ্বাস দশটি---পাঁচটি করণীয় অর্থাৎ এগুলো করা যে ওয়াজিব, তা বিশ্বাস করা জরুরী। যথা, ১. কালেমা উচ্চারণ করা, ২. নামায কায়েম করা, ৩. যাকাত দেওয়া, ৪. রমযানের রোযা রাখা এবং ৫. বায়তুল্লাহ্‌র হজ্ব করা। আর পাঁচটি বর্জনীয় অর্থাৎ এগুলো করা হারাম এরূপ বিশ্বাস রাখা জরুরী। যথা, ১. চুরি করা, ২. ব্যভিচার করা, ৩. হত্যা করা, বিশেষত সন্তান হত্যা করা, ৪. অপবাদ আরোপ করা, ৫. সৎ কাজে অবাধ্যতা করা, এতে গীবত, জুলুম, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করা ইত্যাদি দাখিল আছে। এখন সব বিশ্বাসের সমষ্টি হল উনিশ। সম্ভবত এক এক বিশ্বাসের শাস্তি দেওয়ার জন্য এক একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। তওহীদের বিশ্বাসটি সর্ববৃহৎ বিধায় তার জন্য একজন বড় ফেরেশতা মালেককে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই আয়াতের বিষয়বস্তু শুনে কাফিররা উপহাস করেছিল। (তাই পরবর্তী বিষয়বস্তু নাযিল হয় অর্থাৎ) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক (মানুষ নয়) কেবল ফেরেশতা নিযুক্ত করেছি। (তাদের মধ্যে এক একজন ফেরেশতা সমস্ত জিন ও মানবের সমান শক্তিধর)

আমি তাদের সংখ্যা (বর্ণনায়) এরূপ (অর্থাৎ উনিশ) রেখেছি কেবল কাফিরদের পরীক্ষার জন্য যাতে কিতাবীরা (শোনার সাথে সাথে) দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, মু'মিনদের ঈমান বেড়ে যায় এবং কিতাবিগণ ও মু'মিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে (সন্দেহের) রোগ আছে তারা এবং কাফিররা বলে যে, আল্লাহ্ এই আশ্চর্য বিষয়বস্তু দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন? (কিতাবীদের বিশ্বাসী হওয়ার কথা বলার দুটি কারণ সম্ভবপর---১. তাদের কিতাবেও এই সংখ্যা লিখিত আছে। অতএব শোনা মাত্রই মেনে নেবে। তাদের কিতাবে এখন এই সংখ্যা উল্লিখিত না থাকলে সম্ভবত বিকৃতির কারণে মিটে যায়। ২. তাদের কিতাবে যদি এই সংখ্যা না থাকে, তবে তারা ফেরেশতাগণের অসাধারণ শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনা ব্যতীত জানার উপায় নেই; এমন অনেক বিষয় তাদের কিতাবে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং সেগুলোর ন্যায় এই সংখ্যার বিষয়কে অস্বীকার করার কোন ভিত্তি তাদের কাছে ছিল না। অতএব আয়াতে বিশ্বাসের অর্থ হবে অস্বীকার ও উপহাস না করা। এই দু'টি কারণের মধ্য থেকে প্রথম কারণটি স্পষ্ট। মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ারও দুটি কারণ হতে পারে---১. কিতাবীদের বিশ্বাস দেখে তাদের ঈমান গুণগত শক্তিশালী হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সা) কিতাবীদের সাথে মেলামেশা না করা সত্ত্বেও তাদের ওহীর অনুরূপ খবর দেন। অতএব তিনি অবশ্যই সত্য নবী। ২. নতুন কোন বিষয়বস্তু অবতীর্ণ হলেই মু'মিনগণ তৎপ্রতি ঈমান আনত। সুতরাং সংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নাযিল হওয়ার ফলে তাদের ঈমানের পরিমাণ বেড়ে গেল। এরূপ সন্দেহ পোষণ না করার কথাটি তাকীদার্থে সংযুক্ত করা হয়েছে। রোগ কি, এ ব্যাপারেও দুরকম সম্ভাবনা আছে---১. সন্দেহ; কেননা, সত্য প্রকাশিত হলে কেউ কেউ তা অস্বীকার করে এবং কেউ তা মেনে নিতে ইতস্তত করে। মক্কাবাসীদের মধ্যেও এমন লোক থাকা বিচিত্র নয়। ২. নিফাক তথা কপটতা। এমতাবস্থায় আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, মদীনায় কপট বিশ্বাসী থাকবে এবং তাদের এই বক্তব্য হবে। মু'মিন ও কিতাবীদের বিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ না করার বিষয়টি আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, কিতাবীদের বিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ না করা হল আভিধানিক অর্থে এবং মু'মিনদের শরীয়তের পরিভাষাগত অর্থে। অতঃপর উভয় দলের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে মু'মিনগণকে যেমন বিশেষ হিদায়ত দান করেছেন এবং কাফিরদেরকে বিশেষ পথভ্রষ্ট করেছেন, এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দান করেন। (অতঃপর পূর্বের বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের সংখ্যা উনিশ বিশেষ রহস্যের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। নতুবা) আপনার পালনকর্তার (এসব) বাহিনী (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সংখ্যা এত প্রচুর যে, তাদের) সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (তিনি ইচ্ছা করলে অগণিত ফেরেশতাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে পারতেন। এখনও তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা উনিশ হলেও তাদের সহকারী ও সাহায্যকারী অনেক। মুসলিমের হাদীসে আছে, জাহান্নামকে এমতাবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার সত্তর হাজার বল্‌গা থাকবে এবং প্রত্যেক বল্‌গা সত্তর হাজার ফেরেশতা ধারণ করে রাখবে। জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করার যা আসল উদ্দেশ্য, তা সংখ্যাল্পতা অথবা সংখ্যাধিক্য অথবা উনিশ সংখ্যার রহস্য উন্মোচন করা অথবা না করার উপর নির্ভরশীল নয় এবং সেই আসল

উদ্দেশ্য এই যে) এটা (অর্থাৎ জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করা) মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয় (যাতে তারা আযাবের কথা শুনে সতর্ক হয় এবং ঈমান আনে। এই উদ্দেশ্য কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং আসল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যে রেখে এসব বাড়তি বিষয়ের পেছনে না পড়াই যুক্তিসঙ্গত। অতঃপর জাহান্নামের শাস্তির কিছুটা বর্ণনা আছে, যা মানুষের জন্য উপদেশ হওয়ার দিকটিকে ফুটিয়ে তোলে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ) চন্দ্রের শপথ, শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়, নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম। মানুষের জন্য সতর্ককারী— তোমাদের মধ্যে যে, (সৎ কাজের দিকে) অগ্রণী হয়, তার জন্য অথবা যে (সৎ কাজ থেকে) পশ্চাতে থাকে, তার জন্যও। (অর্থাৎ সবার জন্য সতর্ককারী। এই সতর্ককরণের ফলাফল কিয়ামতে প্রকাশ পাবে, তাই কিয়ামতের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিষয়সমূহের শপথ করা হয়েছে। সেমতে চন্দ্রের বৃদ্ধি ও হ্রাস এ জগতের উন্নয়ন ও অবক্ষয়ের নমুনা। চন্দ্র যেমন এক সময়ে তার আলো হারিয়ে ফেলে, তেমনি জগৎও নিরেট অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। এমনি-ভাবে দিবা ও রাত্রির পারস্পরিক সম্পর্কের অনুরূপ সত্যাসত্যের গোপনীয়তা ও বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বজগৎ ও পরকালের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং বিশ্বজগতের বিলুপ্তি রাত্রির অবসানের মত এবং পরকালের প্রকাশ প্রভাতকালীন ঔজ্জ্বল্য সদৃশ। অতঃপর দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) প্রত্যেক ব্যক্তি তার (কুফরী) কৃত-কর্মের বিনিময়ে (জাহান্নামে) আটক থাকবে কিন্তু ডানদিকস্থরা (অর্থাৎ মু'মিনগণ, তাঁদের বিবরণ সূরা ওয়াকিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। নৈকট্যশীলগণও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা জাহা-ন্নামে আটক থাকবে না) তাঁরা থাকবে জান্নাতে (এবং) অপরাধী কাফিরদের অবস্থা (তাদের কাছেই) জিজ্ঞাসা করবে। (জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক বাক্যালাপ কিরূপে হবে, এসম্পর্কে সূরা আ'রাফের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। শাসানোর জন্য এই জিজ্ঞাসা করা হবে। মু'মিনগণ কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করবে) তোমাদেরকে জাহান্নামে কিসে দাখিল করল? তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে (ওয়াজিব) আহার্য দিতাম না এবং যারা (সত্য ধর্মের বিপক্ষে) সমালোচনামুখর ছিল, আমরাও তাদের সাথে মিলে (ধর্মের বিপক্ষে) আলোচনা করতাম এবং প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। (অর্থাৎ নাফরমানীর উপরই আমাদের জীবনাবসান হয়। ফলে আমরা জাহান্নামে চলে এসেছি। এ থেকে জরুরী হয় না যে, কাফিররাও নামায, রোযা ইত্যাদি ব্যাপারে আদিষ্ট। কেননা, জাহান্নামে দুটি বিষয় থাকবে—এক. আযাব ও দুই. আযাবের তীব্রতা। সুতরাং উল্লিখিত কর্মসমূহের সমষ্টি আযাব ও আযাবের তীব্রতা এই দুই-এর কারণ হতে পারে, এভাবে যে, কুফর ও শিরক কারণ হবে আযাবের এবং নামায ইত্যাদির তরক কারণ হবে আযাবের তীব্রতার। কাফিররা নামায-রোযা ইত্যাদির ব্যাপারে আদিষ্ট নয়---এর অর্থ এই নেওয়া হবে যে, নামায-রোযার কারণে তাদের আসল আযাব হবে না এবং মূল ঈমানের সাথে যেহেতু নামায-রোযাও প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়, তাই নামায-রোযা তরক করার কারণে আযাবের তীব্রতা হতে পারে)। অতএব (উল্লিখিত অবস্থায়) সুপারিশ-কারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (অর্থাৎ কেউ তাদের জন্য সুপারিশই

করতে পারবে না। কারণ, অন্য এক আয়াতে আছে ঃ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ—কুফ-

রের কারণে যখন তাদের এই দুর্গতি হবে, তখন) তাদের কি হল যে, তারা (কোরআনের এই) উপদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয় যেন তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গর্দভ, সিংহ থেকে পলায়নপর। (এই তুলনায় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমত গর্দভ বোকামি ও নির্বুদ্ধিতায় সুবিদিত। দ্বিতীয়ত তাকে বন্য ধরা হয়েছে, যে ভয় করার নয়, এমন জিনিসকেও অহেতুক ভয় করে এবং পালিয়ে ফিরে। তৃতীয়ত সিংহকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। ফলে তার পলায়ন যে চরম পর্যায়ের হবে, তা বলাই বাহুল্য। এই পলায়নের অন্যতম কারণ এই যে, কাফিররা কোরআনকে তাদের ধারণায় যথেষ্ট দলীল মনে করে না) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তাকে উন্মুক্ত (ঐশী) কিতাব দেওয়া হোক।---[দুররে-মনসূরে কাতাদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কতক কাফির রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলল ঃ আপনি যদি আমাদের অনুসরণ কামনা করেন, তবে বিশেষভাবে আমাদের নামে আকাশ থেকে এমন কিতাব আসতে হবে, যাতে আপনাকে অনুসরণ করার আদেশ থাকবে। অন্য এক আয়াতে যেমন আছে ঃ

حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَءُهٗ উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তোলার জন্য منشرة (উন্মুক্ত)

শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ; অর্থাৎ সাধারণ পত্র যেমন খোলা হয় ও পঠিত হয়, তেমনি পত্র আমাদের নামে আসা চাই। অতঃপর এই বাজে দাবী খণ্ডন করা হয়েছে ঃ] কখনই না, (এর প্রয়োজন নেই এবং এর যোগ্যতাও তাঁদের মধ্যে নেই। বিশেষত অনুসরণের নিয়তে এই দাবী করা হয়নি)। বরং (কারণ এই যে,) তারা পরকালকে (অর্থাৎ পরকালের আযাবকে) ভয় করে না। তাই (সত্যান্বেষণ নেই। কেবল হঠকারিতাবশতই এসব দাবী করা হয়, যদি কদাচ

এসব দাবী পূরণও করা হয় তবে তার অনুসরণ করবে না। অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ অতঃপর খণ্ডন ও শাসানোর ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে,

যখন প্রমাণিত হল যে, তোমাদের দাবী অনর্থক, তখন এটা) কখনও (হতে পারে) না ; (বরং) এটাই (অর্থাৎ কোরআনই) যথেষ্ট উপদেশ, অন্য সহীফার প্রয়োজন নেই। অতএব যার ইচ্ছা, সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক এবং যার ইচ্ছা, সে জাহান্নামে যাক। আমার তাতে পরওয়া নেই। কোরআন দ্বারা কিছু কিছু মানুষের হিদায়ত হয় না ঠিক, কিন্তু এতে কোরআনের কোন ত্রুটি নেই। কোরআন স্বস্থানে হিদায়ত, কিন্তু) আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না। (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হওয়ার পিছনে অনেক রহস্য আছে। কিন্তু কোরআন অবশ্যই উপদেশ। অতএব এ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর। কেননা) তিনিই (অর্থাৎ তাঁর আযাবই ভয়ের যোগ্য) এবং তিনিই

(বান্দার গোনাহ্) ক্ষমা করার অধিকারী। (অন্য আয়াতে আছে ঃ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুদ্দাস্‌সির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা ইক্‌রার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কোরআন অবতরণ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছু আওয়ায শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, সেই হেরা গিরিগুহায় আগমনকারী ফেরেশতা শূন্য মণ্ডলে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে হেরা গিরিগুহার অনুরূপ তিনি আবার ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বললেন ঃ زملونى زملونى আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে গেলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। তাই আয়াতে তাঁকে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 'হে বস্ত্রাবৃত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি د ث ار থেকে উদ্ভূত। অর্থ শীত ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ পোশাকের উপর ব্যবহৃত অতিরিক্ত বস্ত্র। مزمل শব্দের অর্থ এর কাছাকাছি। রূহুল মা'আনীতে জাবের ইবনে যায়েদ তাবেয়ীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, সূরা মুদ্দাস্‌সির সূরা মুয্‌যাম্মিলের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন কিন্তু উপরে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ওহী বিরতির পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। যদি সূরা মুয্‌যাম্মিল এর আগে অবতীর্ণ হত, তবে হাদীসের বর্ণনাকারী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) তা বর্ণনা করতেন বলা বাহুল্য যে, মুয্‌যাম্মিল ও মুদ্দাস্‌সির শব্দ দুটি প্রায় সমার্থবোধক। হতে পারে যে, একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় সূরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই ঘটনা হচ্ছে জিবরাঈল (আ)-কে আকাশের নীচে চেয়ারে উপবিষ্ট দেখা, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে কম-পক্ষে এতটুকু প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সূরা মুয্‌যাম্মিল ও মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক আয়াত-সমূহ ওহীর বিরতির পর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে নাযিল হয়েছে। সে সম্পর্কে রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে বিরোধ আছে। তবে সূরা ইক্‌রার প্রাথমিক আয়াতসমূহ যে সর্বাগ্রে নাযিল হয়েছে, একথা সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। উভয় সূরা যদিও কাছাকাছি সময়ে একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ

হয়েছে, তবুও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সূরা মুয্‌যাম্মিলের শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যক্তিগত সংশোধন সম্পর্কিত বিধানাবলী রয়েছে এবং সূরা মুদ্দাস্‌সিরের শুরুতে দাওয়াত, তবলীগ ও জনশুদ্ধি সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রদত্ত হয়েছে।

সূরা মুদ্দাস্‌সিরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ এই ঃ قُمْ فَاَنْذِرْ

অর্থাৎ উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান'ও হাতে পারে। অর্থাৎ আপনি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেওয়াও অবান্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এখন আপনি সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোন।

فَاَنْذِرْ শব্দটি انذار থেকে উদ্ভূত। অর্থ সতর্ক করা,। কিন্তু এমন সতর্ক করা, যা স্নেহ ও ভালবাসার উপর ভিত্তিশীল, যেমন পিতা তার সন্তানকে সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে। পয়গম্বরগণ এরূপই করে থাকেন। তাই তাঁরা بشير و نذير উপাধিতে ভূষিত হন। نذير এর অর্থ স্নেহ ও সমমর্মিতার ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ককারী এবং بشير এর অর্থ সুসংবাদদাতা। রসূলুল্লাহ্ (সা)-রও এই উভয় উপাধি কোরআনের স্থানে স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এ স্থলে শুধু সতর্ক করার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত মু'মিন মুসলমান গুণাগুণতি কয়েকজনই ছিল। অবশিষ্ট সবাই ছিল অবিশ্বাসী কাফির, যারা সুসংবাদের নয়---সতর্ক করারই যোগ্য পাত্র ছিল।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই ঃ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ শুধু আপন পালনকর্তার মহত্ত্ব বর্ণনা করুন কথায় ও কাজে। এখানে رب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এটাই এই নির্দেশের মূল কারণ। যিনি সারাজাহানের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই সর্বপ্রকার মহত্ত্ব বর্ণনার যোগ্য। তকবীরের শাব্দিক অর্থ আল্লাহু আকবার বলা হয়ে থাকে। এতে নামাযের তকবীরে তাহ্‌রীমাসহ অন্যান্য তাকবীরও দাখিল আছে। এই নির্দেশকে নামাযের তকবীরে তাহ্‌রীমার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোরআনের ভাষায় কোন ইঙ্গিত নেই।

তৃতীয় নির্দেশ এই ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ — ثياب শব্দটি ثوب-এর বহুবচন। এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড়। রূপক অর্থে কর্মকেও لباس ও ثوب বলা হয়; এমনিভাবে অন্তর, মন, চরিত্র ও ধর্মকেও বলা হয়। মানব দেহকেও لباس বলে ব্যক্ত করা হয়, যার সাক্ষ্য কোরআন ও আরবী বাক্য পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদগণ থেকে উপরোক্ত সকল অর্থই বর্ণিত আছে। বাহ্যত এতে কোন বৈপরীত্য নেই। এমতাবস্থায় নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্রতা থেকে

মুক্ত রাখুন। পায়জামা অথবা লুঙ্গি পায়ের গিঁটের নীচ পর্যন্ত পরিধান করার নিষেধাজ্ঞাও এ থেকে বোঝা যায়। কেননা, গিঁটের নীচ পর্যন্ত পরিহিত বস্ত্র নাপাক হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা থাকে। অতএব কাপড় পবিত্র রাখার আদেশের মধ্যে এ বিষয়ও দাখিল আছে যে, এভাবে কাপড় পরিধান কর যেন নাপাকী থেকে দূরে থাকে। হারাম অর্থ দ্বারা পোশাক তৈরী না করা এবং নিষিদ্ধ কাট্‌সাটে তৈরী না করাও এই আদেশের মধ্যে দাখিল আছে। পোশাক পবিত্র রাখার এই আদেশ বিশেষভাবে নামাযের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। তাই ফিকহ্‌বিদগণ বলেন ঃ নামায ছাড়া অন্য অবস্থায়ও বিনা প্রয়োজনে শরীরকে নাপাক রাখা অথবা নাপাক কাপড় পরিধান করে থাকা অথবা নাপাক জায়গায় বসে থাকা জায়েয নয়। তবে প্রয়োজনের মুহূর্তগুলো ব্যতিক্রমভুক্ত।---(মাযহারী)

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা পছন্দ করেন। এক আয়াতে আছে ঃ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ---হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে। তাই মুসলমানকে সর্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তরকে অভ্যন্তরীণ অশুচি থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে।

চতুর্থ নির্দেশ এই ঃ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ---তফসীরবিদ মুজাহিদ, ইকরামা কাতাদাহ্, যুহরী, ইবনে যায়েদ প্রমুখ এ স্থলে رجز-এর অর্থ নিয়েছেন প্রতিমা। ইবনে আব্বাস (রা) এক রেওয়ায়েতে এর অর্থ নিয়েছেন গোনাহ্। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা অথবা গোনাহ্ পরিত্যাগ করুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তো পূর্ব থেকেই ঐ সবের ধারে কাছে ছিলেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে এই আদেশ করার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতেও এসব বিষয় থেকে দূরে থাকুন। প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অতিশয় গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে রসূলকেই সম্বোধন করে আদেশটি দেওয়া হয়েছে। এতে উম্মত বুঝতে পারবে যে, আদেশটি খুবই গুরুত্ববহ। তাই নিষ্পাপ রসূলকেও এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

পঞ্চম নির্দেশ ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ---অর্থাৎ বেশী পাওয়ার অভিপ্রায়ে কারও প্রতি অনুগ্রহ করো না। এ থেকে জানা যায় যে, প্রতিদানে বেশী দেবে, এই আশায় কাউকে উপঢৌকন দেওয়া নিন্দনীয় ও মাকরূহ্। কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা সাধারণ লোকের জন্য এর বৈধতা জানা গেলেও এটা সাধারণ ভদ্রতার পরিপন্থী। বিশেষত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য এটা হারাম।

ষষ্ঠ নির্দেশ ঃ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ---صبر-এর শাব্দিক অর্থ প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়া ও বশে রাখা। তাই আল্লাহ্ তা'আলার বিধি বিধান প্রতিপালনে প্রবৃত্তিকে কায়েম রাখা, আল্লাহ্‌র

হারামকৃত বস্তুসমূহ থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা এবং বিপদাপদে যথাসাধ্য হাহুতাশ করা থেকে বেঁচে থাকাও সবরের মধ্যে দাখিল। সুতরাং এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক নির্দেশ, যা গোটা দীনকে পরিব্যাপ্ত করে। এ স্থলে বিশেষভাবে এই নির্দেশ দানের কারণ সম্ভবত এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে দীনের প্রতি দাওয়াত এবং শিরক ও কুফরকে বাধা দানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এর ফলশ্রুতি এই ছিল যে, অনেক মানুষ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরোধিতা ও শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হবে। তাই সবর ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলা তাঁর জন্য সমীচীন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কয়েকটি নির্দেশ দেওয়ার পর কিয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। نَاقُور শব্দের অর্থ শিংগা এবং نقر বলে শিংগায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। কিয়ামত দিবস সকল কাফিরের জন্যই কঠিন হবে—এ কথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুষ্টমতি কাফিরের অবস্থাও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ওলীদ ইবনে মুগীরার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দিনার ঃ এই কাফিরের নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ভাষায় তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সওরী বলেন ঃ তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু সবার কাছেই স্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাই কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হত। জনসাধারণের মধ্যে তার উপাধি 'রায়হানা কোরায়শ' খ্যাত ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশত নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ এককের পুত্র একক বলত। তার দাবী ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সে তার পিতা মুগীরা অদ্বিতীয়।---(কুরতুবী) কিন্তু এই পাপিষ্ঠ আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করেনি এবং কোরআনকে আল্লাহ্র কালাম মেনে নেওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা রচনা বকে। সে কোরআনকে যাদু এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদুকর বলে প্রচার করে। তফসীরে কুরতুবীতে তার ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

রসূলে করীম (সা) একদিন حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ থেকে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করছিলেন। ওলীদ ইবনে মুগীরা এই তিলাওয়াত শুনে এ কথা আল্লাহ্র কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধ্য হয় যে ঃ

والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله

لمغرق و انه ليعلو و لا يعلى عليه و ما يقول هذا بشر-

—"আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তাঁর মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোন মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোন জিনেরও হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ চাকচিক্য। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকবে এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়।"

আরবের সর্ববৃহৎ ঐশ্বর্যশালী সরদারের মুখে একথা উচ্চারিত হওয়া মাত্রই কোরাইশদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের দিকে ঝুঁকতে লাগল। অপরদিকে কাফির কোরাইশ সরদাররা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হল। আবূ জাহল বলল ঃ চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি এখনি যাচ্ছি, তাকে ঠিক করে আসব।

আবূ জাহ্‌ল ও ওলীদের কথোপকথন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্যতায় মতৈক্য ঃ আবূ জাহ্‌ল মুখমণ্ডলে কৃত্রিম বিষণ্ণতা ফুটিয়ে ওলীদের কাছে পৌঁছল (এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন কথা বলল, যাতে সে রাগান্বিত হয়)। ওলীদ বলল ঃ ব্যাপার কি, তুমি এমন বিষণ্ণ কেন? আবূ জাহ্‌ল বলল ঃ বিষণ্ণ না হয়ে উপায় কি, তারা সবাই চাঁদা সংগ্রহ করে তোমাকে অর্থকড়ি দেয়। কারণ, তুমি এখন বুড়ো হয়ে গেছ, তোমাকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এখন তারা জানতে পেরেছে যে, তুমি মুহাম্মদ ও ইবনে আবী কোহাফা অর্থাৎ আবূ বকরের কাছে যাতায়াত কর, যাতে তারা তোমাকে কিছু আহার্য দেয়। তুমি খোশামোদের ছলে তাদের কালাম শুনে বাহ্‌বা দাও এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কর। [বাহ্যত চাঁদা করে ওলীদকে অর্থকড়ি দেওয়ার বিষয়টিও মিথ্যা ছিল, যা কেবল তাকে রাগান্বিত করার জন্যই বলা হয়েছিল। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে আহার্য গ্রহণের ব্যাপারটি তো মিথ্যা ছিলই]। একথা শুনে ওলীদ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং অহংকারে পাগলপারা হয়ে বলতে লাগল ঃ একি বললে, আমি মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের রুটির টুকরার মুখাপেক্ষী? তুমি কি আমার ধন-দওলতের প্রাচুর্য সম্পর্কে জান না? লাত ও ওযযার শপথ, আমি কখনও তাদের মুখাপেক্ষী নই। তবে তোমরা যে মুহাম্মদকে উন্মাদ বল, একথা মিথ্যা। এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাদের কেউ তাকে কোন পাগলসুলভ কাণ্ড করতে দেখেছ কি? আবূ জাহ্‌ল স্বীকার করে বলল ঃ না, আমরা তা দেখিনি। ওলীদ বলল ঃ তোমরা তাকে কবি বল। জিজ্ঞাসা করি, তাকে কি কখনও কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছ? আবূ জাহল বলল ঃ না, শুনিনি। ওলীদ বলল ঃ তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বল। বল তো দেখি, এ পর্যন্ত তার কোন কথা মিথ্যা পেয়েছ কি? এর জওয়াবেও আবূ জাহ্‌লকে لا والله (না, আল্লাহ্‌র শপথ) বলতে হল। ওলীদ আরও বলল ঃ তোমরা তাকে অতীন্দ্রিয়বাদী বল। তোমরা কি কখনও তার এমন অবস্থা ও কথাবার্তা দেখেছ বা শুনেছ, যা অতীন্দ্রিয়বাদীদের হয়ে থাকে? আমি অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথাবার্তা ভালরূপেই চিনি। তার

কালাম অতীন্দ্রিয়বাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ ক্ষেত্রেও আবূ জাহ্‌লকে لا والله বলতে হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র কোরাইশ গোত্রের মধ্যে 'আল-আমীন' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। ওলীদের যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় আবূ জাহ্‌ল হার মানতে বাধ্য হল এবং উপরোক্ত কুৎসা রটনার অসারতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করতে লাগল যে, তাহলে কি কথা বলে মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখা যায়! তাই সে ওলীদকেই সম্বোধন করে বলল ঃ তা হলে তুমিই বল মুহাম্মদকে কি বলা যায়। ওলীদ কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করল। অতঃপর আবূ জাহ্‌লের দিকে চোখ তুলে তাচ্ছিল্য প্রকাশার্থে মুখ ভেংচাল। অবশেষে বলল ঃ মুহাম্মদকে উন্মাদ, কবি, অতীন্দ্রিয়বাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। হ্যাঁ, তাকে যাদুকর বললে তা যুৎসই হবে। এ হতভাগা খুব জানত যে, তিনি যাদুকরও নন এবং তাঁর কালামকে যাদুকরদের কালামও বলা যায় না। কিন্তু সে এভাবে তার কথাকে দাঁড় করাল যে, তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও যাদুকরদের যাদুর প্রতিক্রিয়ার ন্যায় হয়ে থাকে। যাদুকররা তাদের যাদু বলে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিত। নাউযুবিল্লাহ্! তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ। যে-ই ঈমান আনে সে-ই তার কাফির পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। ওলীদের এই ঘটনার শেষাংশই কোরআন পাক নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ব্যক্ত করেছে ঃ

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ -

এখানে تقدير শব্দটি قدر থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রস্তাব করা। উদ্দেশ্য এই যে, এই হতভাগা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করারই সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু অপমানের ভয়ে পরিষ্কার মিথ্যা বলা থেকে বিরত রইল। তাই অনেক চিন্তাভাবনার পর প্রস্তাব করল, তাঁকে উপরোক্ত যুক্তির ভিত্তিতে যাদুকর বলা হোক। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ বলে ওর প্রতি পুনঃ পুনঃ অভিসম্পাত করেছেন।

কাফিররাও মিথ্যা ভাষণে বিরত থাকত ঃ চিন্তা করুন, সব কোরাইশ সরদারই কাফির পাপাচারী এবং নানা রকম গোনাহ্ ও অশ্লীল কার্যের সাথে জড়িত থাকত কিন্তু মিথ্যা ভাষণ এমন একটি দোষ, যা থেকে কাফিররাও পলায়ন করত। ইসলাম-পূর্বকালে রোম সম্রাটের দরবারে আবূ সুফিয়ানের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, কাফিররা রসূলে করীম (সা)-এর

বিরোধিতায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল ; কিন্তু মিথ্যা বলায় প্রস্তুত ছিল না। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান বিপরীতমুখী উন্নতির যুগে এই দোষটি যেন দোষই নয় ; বরং সবচাইতে বড় নৈপুণ্যে পরিণত হয়ে গেছে। শুধু কাফির পাপিষ্ঠই নয়, সৎ ও ধার্মিক মুসলমানদের মন থেকেও এর প্রতি ঘৃণা দূর হয়ে গেছে। তারা অনর্গল মিথ্যা বলা ও অপরকে বলতে বাধ্য করাকে গর্বের সাথে বর্ণনা করে।---(নাউযুবিল্লাহ)

সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা একটি নিয়ামত ঃ ওলীদ ইবনে মুগীরাকে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব নিয়ামত দান করেছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল بَنِيْنَ شُهُوْدًا অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা। এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন নিয়ামত, তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততি কাছে উপস্থিত থাকাও আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। তারা পিতামাতার চক্ষু শীতল করে এবং অন্তরকে শান্ত রাখে। তাদের উপস্থিতির দ্বারা পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও কাজকারবারে সাহায্য পাওয়া আর একটি অতিরিক্ত নিয়ামত। বর্তমান বিপরীতমুখী উন্নতি কেবল সোনারূপার মুদ্রা ও কাগজী নোটের নাম রেখেছে আরাম-আয়েশ, যার জন্য পিতামাতা অত্যন্ত গর্বের সাথে সন্তান-সন্ততিকে বিদেশে নিক্ষেপ করে দেয়। তারা এতই আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে, বছরের পর বছর সন্তানের মুখ না দেখলেও সন্তানের মোটা অংকের বেতন ও অগাধ আমদানীর খবর তাদের কানে পৌঁছতে থাকে। তারা এই খবরের মাধ্যমে জাতি-গোষ্ঠীর কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার প্রয়াস পায়। মনে হয়, তারা সুখ ও আরামের অর্থ সম্পর্কেই বেখবর হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলাকে বিস্মৃত হওয়ার পরিণতি এটাই হওয়া স্বাভাবিক যে, তার নিজেদেরকে অর্থাৎ নিজেদের প্রকৃত সুখ ও আরামকেও বিস্মৃত হয়ে যাবে। কোরআন বলে ঃ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اَنْفُسَهُمْ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ---তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন ঃ এটা আবূ জাহ্লের উক্তির জওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশ জন ফেরেশতা, তখন কোরাইশ যুবকদেরকে সম্বোধন করে বলল ঃ মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অতএব তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুদ্দী বলেন ঃ উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাযিল হলে পর জনৈক নগণ্য কোরাইশ কাফির বলে উঠল ঃ হে কোরাইশ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্য আমি একাই যথেষ্ট। আমি ডান বাহু দ্বারা দশজনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয়জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের ফিস্‌সা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় ঃ আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমত, ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট। এখানে যে উনিশজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফিরদেরকে আযাব দেওয়ার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর কিয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা

হয়েছে ঃ كُبَر — اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ শব্দটি كُبْرَى এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, সেটি সাক্ষাত গুরুতর বিপদ। এ ছাড়া তাতে রয়েছে আরো নানা রকম আযাব।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ—এখানে অগ্রে যাওয়ার অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্য ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোন কোন হতভাগা এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়।

رَهِيْنَةٌ—كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ-এর অর্থ এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া। ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে---মালিক তাকে কোন কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দী থাকবে। কিন্তু, 'আস্‌হাবুল ইয়ামীন' তথা ডানদিকের সৎ লোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে।

এখানে জাহান্নামে বন্দী থাকাও অর্থ হতে পারে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য জাহান্নামে বন্দী থাকবে। কিন্তু 'আস্‌হাবুল ইয়ামীন' বন্দী থাকবে না। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা গেল যে, আস্‌হাবুল ইয়ামীন তারা, যারা ঋণ পরিশোধ করেছে এবং করজ ও ফরয সব আদায় করেছে। অতএব তাদের বন্দী থাকার কোন কারণ নেই। এই তফসীর বাহ্যত নির্মল ও সহজবোধ্য। পক্ষান্তরে যদি আটক থাকার অর্থ হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত এবং দোযখে প্রবেশ করার পূর্বে কোন স্থানে আটক থাকা নেওয়া হয়, তবে এর সারমর্ম এই হবে যে, সব লোক হিসাব-নিকাশের জন্য আটক থাকবে এবং হিসাব না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোথাও যেতে পারবে না। এমতাবস্থায় আস্‌হাবুল ইয়ামীন তারা হতে পারে, যাদের হিসাব-নিকাশ নেই এবং নিষ্পাপ। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা। এটা হযরত আলীর উক্তি। অথবা তারা হতে পারে, যাদের সম্পর্কে হাদীসে আছে ঃ এই উম্মতের অনেক লোককে হিসাব থেকে মুক্তি দিয়ে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করা হবে। সূরা ওয়াকিয়ায় হাশরে উপস্থিত লোকদের তিন প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে---১. অগ্রগামী ও নৈকট্যশীল, ২. ডানদিকস্থ লোক ও ৩. বাম দিকস্থ লোক। এই সূরায় নৈকট্যশীল-গণকে ডান দিকস্থ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে শুধু 'আস্‌হাবুল ইয়ামীন' উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থের দিক দিয়ে সকল আস্‌হাবুল ইয়ামীন হিসাব থেকে মুক্ত থাকবে---একথা কোন আয়াত অথবা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। তাই এ আয়াতের তফসীর জাহান্নামে আটক থাকা গ্রহণ করলে সেটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ—এখানে هُمْ সর্বনাম দ্বারা সেসব অপরাধীকে বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ স্বীকার করেছে—১. তারা নামায পড়ত না, ২. তারা কোন অভাবগ্রস্ত ফকীরকে আহার্য দিত না অর্থাৎ দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, ৩. ভ্রান্ত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত অথবা গোনাহ্ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, ৪. তারা কিয়ামত অস্বীকার করত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ্ করে এবং কিয়ামত অস্বীকার করার মত কুফরী করে, তাদের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা, তারা কাফির। কাফিরের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহণীয় হবে না। যদি সব সুপারিশকারী একত্রিত হয়ে জোরেসোরে সুপারিশ করে, তাতেও উপকার হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ বলা হয়েছে।

কাফিরের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না, মু'মিনের জন্য হবে ঃ এই আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, মুসলমান গোনাহ্গার হলেও তার জন্য সুপারিশ উপকারী হবে। অনেক সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবীগণ, ওলীগণ, সৎকর্মপরায়নগণ—এমনকি সাধারণ মু'মিনগণও অপরের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তা কবূল হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেন ঃ পরকালে আল্লাহর ফেরেশতাগণ, পয়গম্বরগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপীদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাঁদের সুপারিশের কারণে পাপীরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তবে উপরোল্লিখিত চার প্রকার লোক মুক্তি পাবে না ; অর্থাৎ যারা নামায ও যাকাত তরক করে, কাফিরদের ইসলাম বিরোধী কথাবার্তায় শরীক থাকে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে। এ থেকে জানা যায় যে, বেনামাযী ও যাকাত তরককারীর জন্য সুপারিশ কবূল হবে না। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে এ কথাই শুদ্ধ মনে হয় যে, যারা কিয়ামত অস্বীকার সহ উপরোক্ত চারটি অপরাধ করবে, তাদের জন্যই সুপারিশ কবূল হবে না। আর যারা কিয়ামত অস্বীকার ব্যতীত আলাদা আলাদা অন্যান্য অপরাধ করবে, তাদের জন্য এই শাস্তি জরুরী নয়। কিন্তু কতক হাদীসে বিশেষ বিশেষ গোনাহ্গার সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তারা সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সুপারিশ বা নবী-রসূলগণের শাফা'আত সত্য বলে বিশ্বাস করে না অথবা হাউযে কাওসারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সুপারিশ এবং হাউযে কাওসারে তার কোন অংশ নেই।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ—এখানে تَذْكِرَة তথা উপদেশ বলে কোরআন মজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর শাব্দিক অর্থ স্মারক। কোরআন পাক আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী, রহমত, গযব, সওয়াব ও আযাবের অদ্বিতীয় স্মারক। শেষে বলা

হয়েছে كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ—অর্থাৎ নিশ্চিতই কোরআন উপদেশ, যা তোমরা বর্জন করে রেখেছ। قسورة এর অর্থ সিংহ এবং তীরন্দাজ শিকারী। এ স্থলে সাহাবায়ে কিরাম থেকে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে।

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ—আল্লাহ্ তা'আলা اهل تقوى এই অর্থে যে, একমাত্র তিনিই ভয় করার ও তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার যোগ্য। اهل مغفرت হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই বড় বড় অপরাধী ও গোনাহ্‌গারের অপরাধ ও গোনাহ্ যখন ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। অন্য কেউ এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না।

سورة القيامة

সূরা কিয়ামত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪০ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝١ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢ اَيَحْسَبُ
الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝٣ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ۝٤
بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۝٥ يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦ فَاِذَا بَرِقَ
الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ
يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمُسْتَقَرُّ ۝١٢
يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝١٣ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ
بَصِيْرَةٌ ۝١٤ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝١٥ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝١٦ اِنَّ
عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝١٧ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۝١٨ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا
بَيَانَهٗ ۝١٩ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۝٢٠ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝٢١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ
نَّاضِرَةٌ ۝٢٢ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝٢٤ تَظُنُّ
اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝٢٥ كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝٢٦ وَقِيْلَ مَنْ ۜ
رَاقٍ ۝٢٧ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝٢٨ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝٢٩ اِلٰى
رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمَسَاقُ ۝٣٠ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۝٣١ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝٣٢
ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ۝٣٣ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۝٣٤ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۝٣٥ اَيَحْسَبُ

الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ
عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴿٣٩﴾
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের, (২) আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়--(৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না ? (৪) পরন্তু আমি তার অংগুলীগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (৫) বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায় ; (৬) সে প্রশ্ন করে---কিয়ামত দিবস কবে ? (৭) যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, (৮) চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে (৯) এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে--(১০) সেই দিন মানুষ বলবে ঃ পলায়নের জায়গা কোথায় ? (১১) না, কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। (১২) আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে। (১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। (১৪) বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান, (১৫) যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে। (১৬) তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। (১৭) এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। (১৮) অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। (১৯) এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব। (২০) কখনও না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস (২১) এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। (২২) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। (২৩) তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (২৪) আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (২৫) তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর -ভাঙ্গা আচরণ করা হবে। (২৬) কখনও না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে (২৭) এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে (২৮) এবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে (২৯) এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে। (৩০) সেদিন আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে। (৩১) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি ; (৩২) পরন্তু মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (৩৩) অতঃপর সে দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ ! (৩৫) অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে ? (৩৭) সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না ? (৩৮) অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। (৩৯) অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল ---নর ও নারী। (৪০) তবুও কি সেই আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের। আরও শপথ করি সেই মনের যে নিজেকে ধিক্কার দেয় (অর্থাৎ সৎ কাজ করে বলে ঃ আমি কি করেছি। আমার কাজে আন্তরিকতা ছিল না, এতে অমুক দোষ ছিল। আর যদি গোনাহ্ হয়ে যায়, তবে খুব অনুতাপ করে।— (দুররে মনসূর) এই অর্থের দিক দিয়ে নফসে মুতমায়িন্না তথা প্রশান্ত মনও এতে দাখিল আছে। শপথের জওয়াব উহ্য আছে; অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। উভয় শপথ স্থানোপযোগী। কেননা, কিয়ামত হচ্ছে পুনরুত্থানের স্থান। আর ধিক্কারকারী মন কার্যত কিয়ামত বিশ্বাস করে। অতঃপর যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করে, তাদেরকে খণ্ডন করা হয়েছে ঃ) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? (এখানে মানুষ মানে কাফির। অস্থিই দেহের আসল খুঁটি, তাই বিশেষভাবে অস্থির কথা বলা হয়েছে। অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আমি অবশ্যই একত্রিত করব এবং এই একত্রিত করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কেননা) আমি তার অংগুলীগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (দুই কারণে অংগুলী উল্লেখ করা হয়েছে ঃ এক, অংগুলী দেহের অংশ এবং প্রত্যেক বস্তু তার অংশ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। আমাদের বাক-পদ্ধতিতেও এরূপ স্থলে বলা হয় ঃ আমার অংগে অংগে ব্যথা; অর্থাৎ সমস্ত দেহে ব্যথা। দুই, অংগুলী ছোট হলেও তাতে শিল্প নৈপুণ্য অধিক এবং স্বভাবত কঠিন। সুতরাং যে একে সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম হবে, সে সহজ কাজ আরও বেশী পারবে। কিন্তু কতক লোক আল্লাহ্র কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করে না)। বরং মানুষ (কিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়ে) ভবিষ্যৎ জীবনেও (নির্বিবাদে) পাপাচার করতে চায়। তাই (অস্বীকারের ছলে) সে প্রশ্ন করে কিয়ামত দিবস কবে? (অর্থাৎ সে সারা জীবন গোনাহ্ ও কুপ্রবৃত্তিতে অতিবাহিত করবে বলে স্থির করে নিয়েছে। তাই সে সত্যান্বেষণের চিন্তাই করে না যে, কিয়ামত হবে বলে বিশ্বাস করবে। ফলে উপর্যুপরি অস্বীকারই করে)। অতএব যখন (বিস্ময়াতিশয্যে) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, (এই বিস্ময়ের কারণ হবে এই যে, যেসব বিষয়কে সে মিথ্যা মনে করত, সেগুলো হঠাৎ চোখের সামনে মূর্তমান হয়ে দেখা দেবে)। এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে (শুধু চন্দ্রই কেন, বরং) সূর্য ও চন্দ্র (উভয়ই) এক রকম (অর্থাৎ জ্যোতিহীন) হয়ে যাবে, (চন্দ্রকে পৃথক বর্ণনা করার কারণ সম্ভবত এই যে, চান্দ্র হিসাব রাখার কারণে আরবরা এর অবস্থা অধিক গুরুত্ব সহকারে নিরীক্ষণ করত)। সেদিন মানুষ বলবে ঃ এখন পলায়নের জায়গা কোথায়? (ইরশাদ হচ্ছে ঃ) কখনই (পলায়ন সম্ভবপর) নয়। (কেননা) কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন আপনার পালনকর্তার কাছেই ঠাঁই হবে। (এরপর হয় জান্নাতে যাবে, না হয় জাহান্নামে। পালনকর্তার সামনে যাওয়ার পর) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং যা পশ্চাতে রেখেছে। (মানুষের নিজ কর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া অবহিত করার উপরই নির্ভরশীল নয়) বরং মানুষ নিজেই নিজের কর্ম সম্পর্কে (আপনা আপনি জাজ্জ্বল্যমান হওয়ার কারণে) চক্ষুষ্মান হবে যদিও (স্বভাবদোষে তখনও) তার অজুহাত (বাহানা) পেশ করতে চাইবে। (কাফিররা বলবে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ —কিন্তু মনে মনে জানবে যে, তারা মিথ্যাবাদী।

অতএব অবহিত করার জন্য অবহিত করা হবে না।; বরং হুঁশিয়ার ও নিরুত্তর করার জন্য হবে)। হে পয়গম্বর, (بَلِ الْاِنْسَانُ وَ يُنَبَّؤُ থেকে দুটি বিষয় জানা যায়---এক. আল্লাহ্ তা'আলা সব বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা উপযোগিতার তাগিদে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান মানুষের চিন্তায় উপস্থিত করে দেন যদিও তা সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত হয়। কিয়ামতের দিন এরূপ করা হবে। সুতরাং আপনি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় কিছু বিষয়বস্তু ভুলে যাবেন---এই আশংকায় এত কষ্ট কেন স্বীকার করবেন যে, একাধারে ওহীও শুনবেন, তা পাঠও করবেন এবং লক্ষ্যও রাখবেন; যেমন এ পর্যন্ত এই কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন। কেননা, আমি যখন আপনাকে পয়গম্বর করেছি এবং আপনাকে তবলীগের দায়িত্ব দিয়েছি, তখন উপযোগিতার তাগিদ এটাই যে, এতদসংক্রান্ত বিষয়বস্তু আপনার চিন্তায় উপস্থিত রাখতে হবে। আমি যে এই উপস্থিত রাখতে সক্ষম, তা বলাই বাহুল্য। অতএব, এখন থেকে আপনি আর এ কষ্ট স্বীকার করবেন না এবং যখন ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন) আপনি (ওহী শেষ হওয়ার পূর্বে) দ্রুত কোরআন আবৃত্তি করবেন না, যাতে আপনি তা তাড়াতাড়ি শিখে নেন। (কেননা) আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং (আপনার মুখে) তা পাঠ করানো আমার দায়িত্ব। অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি (অর্থাৎ আমার ফেরেশতা পাঠ করে) তখন আপনি (সর্বান্তকরণে) সেই পাঠের অনুসরণ করুন (অর্থাৎ সেদিকেই মনোনিবেশ করুন এবং আবৃত্তিতে মশগুল হবেন না। অন্য আয়াতে আছে ঃ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ—) অতঃপর (আপনার মুখে মানুষের সামনে) এর বিশদ বর্ণনাও আমার দায়িত্ব। (অর্থাৎ আপনাকে মুখস্থ করানো, আপনার মুখে উচ্চারিত করা এবং তবলীগের সময়েও মনে রাখা ও মানুষের সামনে পাঠ করিয়ে দেওয়া, এসব আমার দায়িত্ব। এই বিষয়বস্তু প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হল। অতঃপর আবার কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে ---) অবিশ্বাসীরা, (কিয়ামতে অবশ্যই মানুষকে অগ্রপশ্চাতের কর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। তোমরা তো মনে কর কিয়ামত হবে না,) কখনও এরূপ নয়। (তোমাদের কাছে এর না হওয়ার কোন প্রমাণ নেই)। বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস এবং (এতে মগ্ন হয়ে) পরকালকে (গাফেল হয়ে) উপেক্ষা কর। (সুতরাং যার ভিত্তিতে তোমরা কিয়ামত অস্বীকার কর, তা ভ্রান্ত। অতএব, কিয়ামত হবে এবং প্রত্যেকেই তার কর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়ে উপযুক্ত প্রতিদান পাবে, যার বিবরণ এই ঃ) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদার হয়ে পড়বে। তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর ভাঙ্গা আচরণ করা হবে। (অর্থাৎ কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অতঃপর শাসানো হচ্ছে যে, তোমরা যে পার্থিব জীবনকে প্রিয় এবং পরকালকে বর্জনীয় মনে করছ,) কখনও এরূপ নয়। (কেননা, দুনিয়ার সাথে একদিন বিচ্ছেদ হবেই এবং সবশেষে পরকালে যেতে হবে)। যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং (খুব পরিতাপ সহকারে) বলা হয় (অর্থাৎ শুশ্রূষা-কারী বলে ঃ) কোন ঝাড়ফুঁককারী আছে কি ? (উদ্দেশ্য যে কোন চিকিৎসক। আরবে

ঝাড়ফুঁকের প্রচলন বেশী ছিল বলে رَاقٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে) এবং তখন সে (মরণোন্মুখ ব্যক্তি) বিশ্বাস করে যে, (দুনিয়া থেকে) বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। এবং (তীব্র মৃত্যু যন্ত্রণার কারণে) গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যায়। (অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গোছার কথা বলা হয়েছে। এমতাবস্থায়) সেদিন তোমার পালনকর্তার নিকট নীত হবে। (এমতাবস্থায় দুনিয়াপ্রীতি ও পরকাল বর্জন খুবই মূর্খতা। আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার পর যদি সে কাফির হয়, তবে তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে। কেননা,) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি, কিন্তু (আল্লাহ্ ও রসূলকে) মিথ্যারোপ করেছে এবং (বিধানাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (তদুপরি সত্যের প্রতি আহবানকারীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তজ্জন্য) দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। (উদ্দেশ্য এই যে, কুফর এবং অবাধ্যতা করে তজ্জন্য অনুতাপও করেনি, বরং উল্টা গর্ব করত এবং চাকর-নওকর ও পরিবার-পরিজনের কাছে যেয়ে আরও বেশী অহংকারী হয়ে যেত। এরূপ ব্যক্তিকে বলা হবে ঃ) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ (আবার শোন) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (এক বচনকে পুনঃ পুনঃ বলায় অধিক পরিমাণ জানা গেল এবং বহু বচনকে পুনঃ পুনঃ বলায় শুণের আধিক্য জানা গেল। মানুষের আদিষ্ট হওয়া ও পুনরুজ্জীবিত হওয়ার উপর উপরোক্ত প্রতিদান নির্ভরশীল। তাই অতঃপর এই দুটি বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে)। মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? (বিধানাবলী আরোপ করা হবে না এবং তার হিসাব নিকাশও হবে না? বরং উভয় বিষয় নিশ্চিত। পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করাও তার নির্বুদ্ধিতা)। সে কি (প্রথমে নিছক মায়ের গর্ভাশয়ে) স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর সে রক্তপিণ্ড হয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্ তাকে (মানবরূপে) সৃষ্টি করেছেন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল---নর ও নারী। (অতএব, যে আল্লাহ্ প্রথমে স্বীয় কুদরত দ্বারা এসব করেছেন,) সেই আল্লাহ্ কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন? (অথচ পুনরায় সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজতর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ—এখানে لَا অব্যয়টি অতিরিক্ত। কারও বিরোধী মনোভাব খণ্ডন করার জন্য শপথ করা হলে শপথের পূর্বে অতিরিক্ত لَا ব্যবহৃত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমাদের ভাষায়ও মাঝে মাঝে তাকীদযোগ্য বিষয়বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয় 'না', এরপর স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। এ সূরায় কিয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার ও তাদের সন্দেহ-সংশয়ের জওয়াব দান করা হয়েছে। প্রথমে কিয়ামত দিবস পরে 'নফসে-লাওয়ামা' তথা ধিক্কারকারী মনের শপথ করে সূরা শুরু করা হয়েছে। শপথের জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য আছে; অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। কিয়ামতের শপথ যে স্থানোপযোগী

হয়েছে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এমনিভাবে নফ্সে-লাওয়ামার শপথেও তার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্র কাছে মকবুল হওয়ার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। 'নফ্স' শব্দের অর্থ প্রাণ ও আত্মা সুবিদিত। لوامة শব্দটি لوم থেকে উদ্ভূত। অর্থ তিরস্কার ও ধিক্কার দেওয়া। 'নফ্সে-লাওয়ামা' বলে এমন নফ্স বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ কৃত গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে যে, তুই এমন করলি কেন? সৎ কর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশী সৎ কাজ সম্পাদন করে উচ্চ মর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কামিল মু'মিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজের জন্য নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে তিরস্কার করার হেতু বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সৎ কাজে তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফ্স ইচ্ছা করলে আরও বেশী সৎ কাজ করতে পারত। সে বেশী সৎ কাজ করল না কেন? এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।---(ইবনে কাসীর) এই অর্থের ভিত্তিতেই হযরত হাসান বসরী (র) নফ্সে লাওয়ামার তফসীর করেছেন 'নফ্সে-মু'মিনা।' তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্র কসম, মু'মিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ধিক্কারই দেয়। সৎ কর্ম-সমূহেও সে আল্লাহ্র শানের মুকাবিলায় আপন কর্মে অভাব ও ত্রুটি অনুভব করে। কেননা, আল্লাহ্র হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ত্রুটি থাকে এবং তজ্জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হাসান বসরী (র) প্রমুখের এই তফসীর অনুযায়ী নফ্সে লাওয়ামার শপথ করার উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মু'মিন ব্যক্তিদের সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশ করা, যারা নিজেদের কাজ কর্ম হিসাব করে ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হয় ও নিজেদেরকে তিরস্কার করে।

নফ্সে লাওয়ামার এই তফসীরে 'নফ্সে মুতমায়িন্নাও' দাখিল আছে। এগুলো 'নফ্সে মুত্তাকীরই' উপাধি।

নফ্সে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িন্না ঃ সূফী বুযুর্গগণ বলেন ঃ নফ্স মজ্জাগত ও স্বভাবগতভাবে اَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সৎ কর্ম ও সাধনার বলে সে নফ্সে লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎ কর্মে উন্নতি ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়ত-বিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফ্সই মুতমায়িন্না উপাধি প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর কিয়ামত-অবিশ্বাসীদের একটি সাধারণ প্রশ্নের জওয়াব আছে। প্রশ্ন এই যে,

মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। তার অস্থিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সেগুলোকে পুনরায় একত্র করে কিরূপে জীবিত করা হবে? জওয়াবে বলা হয়েছে ঃ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ ——এর সারমর্ম এই যে, চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহকে একত্র করে পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তোমরা বিস্মিত হচ্ছ ঃ অথচ এ বিষয়টি পূর্বে একবার প্রত্যক্ষ করেছ যে, দুনিয়াতে পালিত ও বর্ধিত প্রত্যেক মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও কণা নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। অতএব, যে ক্ষমতাশালী সত্তা প্রথমবার সারা বিশ্বে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একজন মানুষের অস্তিত্বে একত্র করেছেন, এখন পুনরায় সেগুলোকে একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কিরূপে কঠিন হবে? তিনি পূর্বে যেমন তার কাঠামোতে আত্মা রেখে তাকে জীবিত করেছেন, পুনরায় এরূপ করলে তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন?

দেহ পুনরুত্থানে কুদরতের অভাবনীয় কর্ম ঃ চিন্তার বিষয় এটা যে, একজন মানুষ যে দেহাবয়ব ও আকার-আকৃতিতে প্রথমে সৃজিত হয়েছিল, আল্লাহ্‌র কুদরত পুনর্বারও তার অস্তিত্বে সে সব বিষয় চুল পরিমাণ পার্থক্য ব্যতিরেকে সন্নিবেশিত করে দেবেন। অথচ সৃষ্টির আদিকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কত বিচিত্র আকার-আকৃতির মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কার সাধ্য যে, তাদের সবার আকার-আকৃতি ও দৈহিক গঠনের গুণাগুণ আলাদা আলাদাভাবে স্মরণও রাখতে পারে---পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন যে, আমি কেবল মৃত ব্যক্তির বড় ও প্রধান প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই পূর্ববৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম নই বরং মানব অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতম অঙ্গকেও সম্পূর্ণ পূর্বের ন্যায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। আয়াতে বিশেষভাবে অংগুলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই মানুষের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ। এই ছোট অঙ্গের পুনঃ সৃষ্টি-তেই যখন কোন পার্থক্য হবে না, তখন হাত পা ইত্যাদি বড় বড় অঙ্গের তো কথাই নেই।

চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বিশেষভাবে অংগুলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এক মানুষকে অন্য মানুষ থেকে পৃথক করার জন্য তার সর্বাঙ্গেই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা সে আলাদাভাবে পরিচিত হয়। বিশেষত মানুষের যে মুখমণ্ডল কয়েক বর্গ ইঞ্চির বেশী নয়, তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এমন সব স্বাতন্ত্র্য রেখেছেন, যার ফলে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একের মুখমণ্ডল অপরের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিল খায় না। মানুষের জিহবা ও কণ্ঠনালী সম্পূর্ণ একই রকম হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে স্বতন্ত্র। ফলে, বালক, বৃদ্ধ এবং নারী ও পুরুষের কণ্ঠস্বর আলাদা-আলাদাভাবে চিনা যায় এবং প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠস্বর পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়। আরও বেশী বিস্ময়কর বস্তু হচ্ছে মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অংগুলীর অগ্রভাগ। এগুলোর উপর যে সব রেখা ও কারুকার্যের জাল বিস্তৃত আছে, তা কখনও একে অপরের সাথে মিলে না। অথচ মাত্র অর্ধ ইঞ্চি পরিসরের মধ্যে এসব পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিহীন স্বাতন্ত্র্য নিহিত আছে। প্রাচীন ও আধুনিক প্রতি যুগে বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপকে একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বস্তুরূপে গণ্য করে এর ভিত্তিতেই আদালতের ফয়সালা হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, এটা কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক অংগুলীর অগ্রভাগের রেখাও এমনিভাবে স্বতন্ত্র।

একথা বুঝে নেওয়ার পর বিশেষভাবে অংগুলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করার কারণ আপনা-আপনি হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তো এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ কর যে, এই মানুষ পুনরায় কিরূপে জীবিত হবে! আরও সামান্য অগ্রসর হয়ে চিন্তা কর যে, কেবল জীবিতই হবে না বরং তার পূর্বের আকার-আকৃতিও প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সহকারে জীবিত হবে। এমনকি, পূর্বের সৃষ্টিতে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অঙ্গুলীসমূহের রেখা যেভাবে ছিল, পুনঃ সৃষ্টিতেও তদ্রূপই থাকবে।

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ—اَمَامَهٗ শব্দের অর্থ সম্মুখ ও ভবিষ্যত। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফির ও গাফিল মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের এসব চাক্ষুষ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, যাতে অতীতের অস্বীকারের দরুন অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যত ঠিক করে নিতে পারে বরং ভবিষ্যতেও সে কুফর, শিরক, অস্বীকার ও মিথ্যারোপে অটল থাকতে চায়।

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ—এখানে কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। برق অর্থ চক্ষুতে ধাঁধা লেগে গেল এবং দেখতে পারল না। কিয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগে যাবে। ফলে চক্ষু স্থির কোন বস্তু দেখতে পারবে না। خسف শব্দটি خسوف থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ—এতে বলা হয়েছে যে, শুধু চন্দ্রই জ্যোতিহীন হবে না বরং সূর্যের দশাও তাই হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আসল আলো সূর্যের মধ্যে নিহিত। চন্দ্রও সূর্যের কিরণ থেকে আলো লাভ করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একত্র করা হবে এবং উভয়েই জ্যোতি হারিয়ে ফেলবে। কেউ কেউ বলেন, চন্দ্র ও সূর্যকে একত্র করার অর্থ এই যে, সেদিন উভয়েই একই উদয়াচল থেকে উদিত হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত আছে।

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ—অর্থাৎ মানুষকে সে দিন অবহিত করা হবে, যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সৎ কাজ করে নেয়, তা সে অগ্রে প্রেরণ করে এবং যে সৎ অথবা অসৎ উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে (এর সওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে)। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন ঃ ما قدم বলে এমন সৎ কাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে নেয় এবং ما اخر বলে এমন সৎ কাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে পারত কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে।

بصيرة ও بصير — بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ

এর অর্থ চক্ষুষ্মান। এর অপর অর্থ প্রমাণও হয়ে থাকে। কোরআনে আছে ঃ لَقَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ — এখানে بصائر শব্দটি بصيرة এর বহুবচন। অর্থ প্রমাণ। معاذير শব্দটি ওযর অর্থে معذار এর বহুবচন। আয়াতের অর্থ এই যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। এছাড়া হাশরের মাঠে প্রত্যেকে তার সৎ-অসৎ কর্ম স্বচক্ষে দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে ঃ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا

অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে হাশরের মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে بَصِيْرَةٌ- এর অর্থ প্রমাণ হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে। কিন্তু মানুষ তার অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা সত্ত্বেও বাহানাবাজি ত্যাগ করবে না। সে তার কৃতকর্মের অজুহাত পেশ করতেই থাকবে। وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ বাক্যের অর্থ তাই।

এ পর্যন্ত কিয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা আলোচিত হল। পরেও এই আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরাঈল (আ) কোরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। এক. কোথাও এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায়। দুই. কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন জিবরাঈল (আ) কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহ্বা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বারবার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন বিশুদ্ধ পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলমানদের কাছে হু-বহু তা পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে দ্রুত নাড়া দেওয়ার কষ্ট করবেন না। لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ বাক্যের অর্থ তাই। এরপর বলেছেন ঃ اِنَّ

عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ অর্থাৎ আয়াতসমূহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এরপর বলা হয়েছে ঃ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ—এখানে কোরআনের অর্থ পাঠ। অর্থ এই যে, যখন আমি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ) কোরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না বরং চুপ করে শোনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কোরআন অনুসরণ করার মানে চুপ করে জিবরাঈলের পাঠ শ্রবণ করা। সকল তফসীরবিদই এতে একমত।

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাআত না করার একটি প্রমাণ ঃ সহীহ্ হাদীসে আছে অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যই নামাযে ইমাম নিযুক্ত হয়। অতএব, মুক্তাদীদের উচিত ইমামের অনুসরণ করা। যখন সে রুকূ' করে, তখন সব মুক্তাদী রুকূ' করবে এবং যখন সিজদা করে তখন সবাই সিজদা করবে। মুসলিমের রেওয়ায়েতে তৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে—যখন ইমাম কিরা'আত করে, তখন তোমরা চুপ করে শ্রবণ কর। اذا قرأ فانصتوا এ থেকেও বোঝা যায় যে, ইমামের অনুসরণ উদ্দেশ্য। রুকূ' ও সিজদায় ইমামের অনুসরণ এই যে, তার সাথে সাথে রুকূ' ও সিজদা আদায় করবে কিন্তু সাথে সাথে কিরা'আত করা কিরা'আতের অনুসরণ নয় বরং কিরা'আতের অনুসরণ এই যে, ইমাম যখন কিরা'আত করবে, তখন তোমরা চুপ করে শুনবে। ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কিরা'আত করা উচিত নয়—এই মাস'আলায় ইমাম আবূ হানীফা (র) ও অপর কয়েকজন ইমামের এটাই দলীল।

অবশেষে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ অর্থাৎ আপনি এ চিন্তাও করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেওয়াও আমার দায়িত্ব, আমি কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। এই চার আয়াতে কোরআন ও তার তিলাওয়াত সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণনা করার পর আবার কিয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতারই অবশিষ্ট আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই চার আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক কি? তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ স্বীয় অসীম কুদরতের বলে প্রত্যেক মানুষকে পূর্বে যে আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আকারে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এমনকি, তার অংগুলীর অগ্রভাগ এবং তাতে অংকিত রেখা ও চিহ্নসমূহকেও হুবহু পূর্বের ন্যায় করে দেবেন। এতে কেশাগ্র পরিমাণ পার্থক্য হবে না। এটা তখনই হতে পারে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানও অসীম হয় এবং তথ্যাবলী সংরক্ষণের পদ্ধতিও অদ্বিতীয় হয়। এর সাথে মিল রেখে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই চার আয়াতে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তো ভুলেও যেতে পারেন এবং বর্ণনায় ভুল করারও আশংকা আছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এসব বিষয়ের উর্ধ্বে। এসব বিষয়ের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। তাই আপনি

কোরআনের বাক্যাবলী সংরক্ষিত রাখা অথবা এগুলোর অর্থ বোঝার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার কষ্ট ছেড়ে দিন। এসব কাজ আল্লাহ্ তা'আলাই সম্পন্ন করবেন। অতঃপর কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ—অর্থাৎ সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হাসি-খুশি ও সজীব হবে এবং তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জান্নাতীগণ চর্মচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নত ওয়াল-জমাআতের সকল আলিম ও ফিক্হবিদ এ বিষয়ে একমত। কেবল মুতাজিলা ও খারেজী সম্প্রদায় এটা স্বীকার করে না। তাদের অস্বীকারের কারণ দার্শনিক সন্দেহ। তাদের ভাষ্য এই যে, চর্মচক্ষে দেখার জন্য দর্শক এবং যাকে দেখা হয় উভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের জন্য যে সব শর্ত রয়েছে, সেগুলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে অনুপস্থিত। আহ্লে সুন্নত-ওয়াল-জমাআতের বক্তব্য এই যে, পরকালে আল্লাহ্র দীদার ও সাক্ষাৎ এসব শর্তের উর্ধ্বে থাকবে। না কোন দিক ও পার্শ্বের সাথে এর সম্পর্ক থাকবে এবং না কোন বিশেষ আকার-আকৃতির সাথে। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। তবে এই দীদার ও সাক্ষাতে জান্নাতিগণের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সপ্তাহে একবার অর্থাৎ শুক্রবারে এই সাক্ষাৎ লাভ করবে, কেউ দৈনিক সকাল বিকাল লাভ করবে এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে।---(মাযহারী)

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ—পূর্ববর্তী আয়াত-সমূহে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আয়াতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈমান ও সৎ কর্মের দিকে ধাবিত হয়। আয়াতে মৃত্যুর চিত্র অংকন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গাফিল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে ঠেকে। শুশ্রূষাকারীরা চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে ঝাড়ফুঁককারীদেরকে খুঁজতে থাকে এবং পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহ্র কাছে যাওয়ার সময়। এ সময়ে কোন তওবা কবুল হয় না এবং কোন আমলও করা যায় না। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত এর আগেই সংশোধনের চেষ্টা করা। وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ —ساق-এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা।

গোছার সাথে গোছা জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে দুই গোছা বলে দুই জগৎ---ইহকাল ও পরকাল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তখন হবে ইহকালের শেষ দিন এবং

পরকালের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ ইহকালের বিরহ-বেদনা এবং পরকালে কি হবে না হবে তার চিন্তায় গ্রেফতার থাকবে।

وَيْل শব্দটি اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى —এর অপভ্রংশ। অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। যে ব্যক্তি কুফর ও মিথ্যারোপকেই আঁকড়ে থাকে এবং দুনিয়ার ধনসম্পদে মত্ত থাকে ও তদবস্থায় মারা যায়, তার জন্য এখানে চারবার وَيْل তথা দুর্ভোগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশের সময় বিপর্যয় ও দুর্ভোগই তোমার প্রাপ্য।

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى—অর্থাৎ জীবন মৃত্যুও সারা বিশ্ব যে সত্তার করতলগত, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন? রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কিয়ামতের এই আয়াত পাঠ করে, তার বলা উচিত بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ—অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনি সক্ষম এবং আমিও এর একজন সাক্ষী। সূরা ত্বীনের শেষ আয়াত اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ পাঠ করার সময়ও একথা বলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি সূরা মুরসালাতের فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ আয়াত পাঠ করে তার বলা উচিত اٰمَنَّا بِاللّٰهِ

سورة الدهر

সূরা দাহ্‌র

মদীনায় অবতীর্ণ, ৩১ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝١
اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا
بَصِيْرًا ۝٢ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝٣ اِنَّآ اَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝٤ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ
كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝٥ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا
۝٦ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝٧ وَ
يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝٨ اِنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝٩ اِنَّا نَخَافُ
مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١٠ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ
وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝١١ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝١٢
مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا
۝١٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝١٤ وَيُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۝١٥ قَوَارِيْرَا
مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝١٦ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا

زَنْجَبِيْلًا ۚ ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
مُّخَلَّدُوْنَ ۚ إِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَاَيْتَ
ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ﴿٢٠﴾ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ
وَّإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾
إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾ ع إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ
اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ الَّيْلِ
فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ
الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ
وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ
هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا
تَشَآءُوْنَ إِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٣٠﴾
يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣١﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (২) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে---এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (৩) আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়। (৪) আমি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি। (৫) নিশ্চয়ই সৎ কর্মশীলরা পান করবে কাফূর মিশ্রিত পানপাত্র। (৬) এটা ঝরনা, যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ

পান করবে---তারা একে প্রবাহিত করবে। (৭) তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী। (৮) তারা আল্লাহ্‌র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (৯) তারা বলে ঃ কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (১০) আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি। (১১) অতঃপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে সে দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (১২) এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। (১৩) তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। (১৪) তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকি থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। (১৫) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্র (১৬) রূপালী স্ফটিক পাত্রে---পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (১৭) তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'যানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র। (১৮) এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরণা। (১৯) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা। (২০) আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নিয়ামত-রাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (২১) তাদের আভরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান-তহুরা'। (২২) এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে। (২৩) আমি আপনার প্রতি পর্যায়-ক্রমে কোরআন নাযিল করেছি। (২৪) অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যেকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফিরের আনুগত্য করবেন না। (২৫) এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। (২৬) রাত্রির কিছু অংশে তার উদ্দেশে সিজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (২৭) নিশ্চয় এরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (২৮) আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (২৯) এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (৩০) আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্যকোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা তার রহমতে দাখিল করেন। আর জালিমদের জন্য তো প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় মানুষের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (অর্থাৎ সে মানুষ ছিল না---বীর্য ছিল, এর আগে খাদ্য এবং এর আগে উপাদান-চতুষ্টয়ের অংশ ছিল)। আমি তাকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। (অর্থাৎ

নর ও নারী উভয়ের বীর্য থেকে। কেননা, নারীর বীর্যও ভিতরে ভিতরে তার গর্ভাশয়ে স্খলিত হয়। এরপর কখনও গর্ভাশয়ের মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং কখনও ভিতরে থেকে যায়। মিশ্র বীর্যের আরেক অর্থ এই যে, এই বীর্য বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হয়ে থাকে এবং এটা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সার কথা, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি) এভাবে যে, তাকে আদিষ্ট করব। অতঃপর (এ কারণে) তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন (সমঝদার) করে দিয়েছি। (বাকপদ্ধতিতে সমঝদার বুদ্ধিমানকেই বিশেষভাবে শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান বলা হয়। তাই আদিষ্ট হওয়ার যে ভিত্তি সমঝদার হওয়া; তা এখানে উল্লিখিত না হলেও বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে আদিষ্ট হওয়ার গুণাবলীসহ সৃষ্টি করেছি। এরপর যখন শরীয়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট হওয়ার সময় আসল, তখন আমি তাকে (ভালমন্দ জ্ঞাত করে) পথনির্দেশ করেছি (অর্থাৎ বিধানাবলী পালন করতে বলেছি। অতঃপর) হয় সে কৃতজ্ঞ (ও মু'মিন) হয়েছে, না হয় অকৃতজ্ঞ (ও কাফির) হয়েছে অর্থাৎ যে পথে চলতে বলেছিলাম, সে সেই পথে চলেছে, সে মু'মিন হয়েছে। পক্ষান্তরে যে সেই পথ সম্পূর্ণ বর্জন করেছে, সে কাফির হয়েছে। অতঃপর উভয় দলের প্রতিফল বর্ণনা করা হয়েছেঃ আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ী ও লেলিহান অগ্নি। (আর) যাঁরা সৎকর্মশীল তাঁরা এমন পানপাত্র (অর্থাৎ পানপাত্র থেকে শরাব) পান করবে যার মিশ্রণ হবে কাফূর অথবা এমন ঝরনা থেকে (পান করবে) যা থেকে আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দাগণ পান করবে এবং যাকে (তারা যথা ইচ্ছা) প্রবাহিত করবে। (জান্নাতের ঝরনাসমূহ জান্নাতীদের অনুগামী হবে এটা তাদের এক কারামত। দুররে মনসূরে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের হাতে স্বর্ণের ছড়ি থাকবে। তারা এসব ছড়ি দ্বারা যে দিকে ইশারা করবে, সে দিকে ঝরনা প্রবাহিত হবে। জান্নাতের কাফূর শুভ্রতা, শীতলতা, চিত্তবিনোদন ও বলবীর্য বর্ধনে অতুলনীয় হবে। শরাবে বিশেষ গুণ সৃষ্টি করার জন্য কতক উপযুক্ত বস্তু মিশ্রিত করার নিয়ম আছে। সে মতে জান্নাতের শরাবে কাফূর মিশ্রিত করা হবে। নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট ঝরনা থেকে শরাবের পাত্র পূর্ণ করা হবে। অতএব এটা উৎকৃষ্টতর হবে, তা বলাই বাহুল্য। এতে করে সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ আরও জোরদার হয়ে যায়। যদি ابرار ও عباد الله বলে একই শ্রেণীর লোক বোঝানো হয়ে থাকে, তবে দুই জায়গায় বর্ণনা করার উদ্দেশ্য পৃথক পৃথক। এক জায়গায় মিশ্রণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় জায়গায় তার আধিক্য ও আয়ত্তাধীন হওয়ার কথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। কেননা বিলাস সামগ্রীর আধিক্য ও আয়ত্তাধীন হওয়া ভোগ-বিলাসের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলা। অতঃপর সৎকর্মশীলদের গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছেঃ) তারা মানত পূর্ণ করে (আন্তরিকতা সহকারে, কেননা) তারা এমন দিনকে ভয় করে, যার কঠোরতা হবে ব্যাপক। (অর্থাৎ কমবেশী সবাই এই কঠোরতার আওতায় পড়বে। এখানে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। তার এমন আন্তরিক যে, আর্থিক ইবাদতেও, যাতে প্রায়শ আন্তরিকতা কম থাকে---তারা আন্তরিক। সেমতে) তারা আল্লাহ্‌র প্রেমে দরিদ্র, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (বন্দী মজলুম হলে তার সাহায্য করা যে শুভ কাজ, তা বর্ণনা-সাপেক্ষ নয়। পক্ষান্তরে অপরাধ করে বন্দী হলে অধিক প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য

দেওয়াও শুভকাজ। তারা আহার্য দিয়ে মুখে অথবা অন্তরে বলে ঃ) কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দেই এবং তোমাদের কাছে কোন (কার্যত) প্রতিদান ও (মৌখিক) কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (কেননা) আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভয়ংকর ও তিক্ত দিনের আশংকা রাখি। (তাই আশা করি যে, এসব আন্তরিক কর্মের বদৌলতে সেদিনের তিক্ততা ও কঠোরতা থেকে নিরাপদ থাকব। এ থেকে জানা গেল যে, পরকালের ভয়ে কোন কাজ করা আন্তরিকতা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনার পরিপন্থী নয়)। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে (এই আনুগত্য ও আন্তরিকতার বরকতে) সে দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (অর্থাৎ মুখমণ্ডলে সজীবতা ও অন্তরে আনন্দ দান করবেন) এবং তাদের দৃঢ়তার প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। তারা তথায় (অর্থাৎ জান্নাতে) আরাম কেদারায় (আরামে ও সসম্মানে) হেলান দিয়ে বসবে। তারা তথায় রৌদ্রতাপ ও শৈত্য অনুভব করবে না (বরং আনন্দদায়ক ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ হবে)। সেখানকার (অর্থাৎ জান্নাতের) বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে (অর্থাৎ নিকটে থাকবে। ছায়া অন্যতম বিলাস উপকরণ। জান্নাতে চন্দ্র-সূর্য নেই। অতএব, ছায়ার মানে কি? জওয়াব এই যে, সম্ভবত অন্যান্য জ্যোতির্ময় বস্তু নিচয়ের আলোকেই ছায়া বলা হয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন সাধন করাই বোধ হয় ছায়ার উপকারিতা। কেননা, এক অবস্থা যতই আরামপ্রদ হোক না কেন, অবশেষে তা থেকে মন ভরে যায়)। এবং জান্নাতের ফলমূল তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। (ফলে সর্বক্ষণ সর্বভাবে অনায়াসে তা গ্রহণ করতে পারবে) তাদের কাছে (পানাহারের বস্তু পৌঁছানোর জন্য) রূপার পাত্র পরিবেশন করা হবে এবং স্ফটিকের পানপাত্র। এটা হবে রূপালী স্ফটিক—পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (অর্থাৎ এমন পরিমাপ করে ভর্তি করা হবে যে, অতৃপ্তি না থাকে এবং উদ্বৃত্তও না হয়। কারণ, উভয়ের মধ্যেই বিতৃষ্ণা রয়েছে। রূপালী স্ফটিকের অর্থ এই যে, রূপার মত শুভ্র এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। পার্থিব রূপা স্বচ্ছ নয় এবং স্ফটিক শুভ্র নয়। সুতরাং এটা এক অভূতপূর্ব বস্তু হবে। তথায় তাদেরকে (উল্লিখিত কাফূর মিশ্রিত শরাব ব্যতীত আরও) এমন পাত্রপান পান করানো হবে, যাতে যানজাবীলের মিশ্রণ থাকবে। (উত্তেজনা সৃষ্টি ও মুখের স্বাদ পরিবর্তনের জন্য শরাবে এর মিশ্রণ করারও নিয়ম আছে। অর্থাৎ) এমন ঝরনা থেকে (তাদেরকে পান করানো হবে) যার নাম (সেখানে) সালসাবীল (প্রসিদ্ধ) হবে। (অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত ঝরনার শরাবে কাফূরের এবং এই আয়াতে বর্ণিত ঝরনার শরাবে যানজাবীলের মিশ্রণ থাকবে। এর রহস্য আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। তাদের কাছে (এসব বস্তু নিয়ে) চির কিশোর বালকরা ঘোরাফেরা করবে (তারা এমন সুশ্রী যে) হে পাঠক, তুমি তাদেরকে দেখে মনে করবে যেন বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা। (পরিচ্ছন্নতা ও চাকচিক্যে তাদেরকে মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং চলাফেরার দিক দিয়ে বিক্ষিপ্ত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা উচ্চস্তরের তুলনা। কেবল উল্লিখিত বিলাস-সামগ্রীই নয় বরং সেখানে আরও সর্বপ্রকার বিলাস দ্রব্য এত অধিক ও উচ্চমানের থাকবে যে) হে পাঠক, যদি তুমি সেই স্থানটি দেখ, তবে তুমি অগাধ নিয়ামত ও বিশাল সাম্রাজ্য দেখতে পাবে। তাদের (অর্থাৎ জান্নাতীদের) আভরণ হবে চিকন সবুজ রেশমী বস্ত্র ও

মোটা রেশমী বস্ত্র। (কেননা প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে পৃথক আনন্দ রয়েছে)। তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন। (এই সূরার তিন জায়গায় রূপার আসবাব-পত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে স্বর্ণের আসবাবপত্রের বর্ণনা আছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, উভয় প্রকার আসবাবপত্র থাকবে। এর রহস্য বিলাসব্যসনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন মানসিক প্রবণতার প্রতি নযর রাখা। পুরুষের জন্য অলংকার দূষণীয় বলে প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। কেননা, দুনিয়াতে যা দূষণীয়, পরকালেও তা দূষণীয় হবে---এটা জরুরী নয়)। তাদের পালনকর্তা (তাদেরকে উপরের বর্ণনা অনুযায়ী যে শরাব পান করতে দিবেন, তা দুনিয়ার শরাবের ন্যায় অপবিত্র, বিবেকবুদ্ধি বিলোপকারী ও নেশাযুক্ত হবে না বরং আল্লাহ্ তা'আলা) তাদেরকে শরাবান-তহুরা (পবিত্র শরাব) পান করাবেন। এতে নাপাকী ও ময়লা থাকবে না; যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ সূরার তিন জায়গায় শরাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক জায়গার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম জায়গায় يَشْرَبُونَ দ্বিতীয় জায়গায় يُسْقَوْنَ এবং তৃতীয় জায়গায় سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম জায়গায় সাধারণভাবে পান, দ্বিতীয় জায়গায় সসম্মানে পান এবং তৃতীয় জায়গায় চূড়ান্ত সম্মানের সাথে পান করা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং একই বিষয়-বস্তুর বারবার উল্লেখ হয়নি। এসব নিয়ামত দিয়ে আত্মিক সুখ বৃদ্ধি করার জন্য জান্নাতী-গণকে বলা হবে ঃ এটা তোমাদের প্রতিদান এবং (দুনিয়াতে কৃত) তোমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। [অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, শত্রুদের শাস্তি আপনি শুনলেন। অতএব, এ শত্রুতা ও বিরোধিতার জন্য দুঃখ করবেন না এবং ইবাদত ও প্রচারকার্যে মশগুল থাকুন। এটা যেমন ইবাদত, তেমনি অন্তরকেও শক্তিশালী করে। ইবাদতের বর্ণনা এই ঃ] আমি আপনার প্রতি অল্প অল্প করে কোরআন নাযিল করেছি (যাতে অল্প অল্প করে মানুষের কাছে পৌঁছাতে থাকেন এবং তারা সহজে উপকৃত হতে পারে; যেমন সূরা ইসরার শেষে বলা হয়েছে ঃ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ) অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার (তবলীগসহ) আদেশের উপর অটল থাকুন এবং তাদের মধ্যে কোন পাপিষ্ঠ ও কাফিরের আনুগত্য করবেন না। [অর্থাৎ তারা যে তবলীগ করতে নিষেধ করে, তা মানবেন না। এখানে উদ্দেশ্য গুরুত্ব প্রকাশ করা। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কথা মেনে চলবেন---এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না)। এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদা করুন (অর্থাৎ ফরয নামায পড়ুন) এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়ুন। অতঃপর সান্ত্বনাদানের উদ্দেশ্যে আরও একটি বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কাফিরদেরর নিন্দাও রয়েছে। অর্থাৎ কাফিরদের বিরোধিতার আসল কারণ এই যে) তারা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং ভবিষ্যতে আগমনকারী এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (সুতরাং দুনিয়াপ্রীতি তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা সত্যের

দুশমন হয়ে গেছে। অতঃপর কঠিন দিবসের অসম্ভাব্যতা নিরসন করার জন্য বলা হয়েছে ঃ) আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (অতএব, উভয় বিষয় থেকে আল্লাহ্‌র কুদরত প্রকাশ পায়। কাজেই মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করাই আর বেশী কি কঠিন যে, এটা করার কুদরত হবে না। অতঃপর উল্লিখিত যাবতীয় বিষয়বস্তুর নির্যাস বর্ণনা করা হচ্ছে যে) এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) উপদেশ। অতএব, যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (এরূপ সন্দেহ করা উচিত নয় যে, কেউ কেউ তো কোরআন থেকে হিদায়ত পায় না। আসল ব্যাপার এই যে, কোরআন স্বস্থানে উপদেশ ও যথেষ্ট হিদায়ত, কিন্তু) আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যতীত তোমরা অভিপ্রায় পোষণ করতে পার না। (কতক লোকের জন্য আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় না হওয়ার পশ্চাতে রহস্য আছে। কেন না) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। এবং (যাকে ইচ্ছা, কুফর ও পাপাচারে ডুবিয়ে রাখেন)। তিনি জালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা দাহ্‌রের অপর নাম সূরা 'ইনসান' ও সূরা 'আবরার'।---(রূহুল মা'আনী) এতে মানব সৃষ্টির আদি-অন্ত, কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি, কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর বিশুদ্ধ ও সাবলীল ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

هل—هَلْ أَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

অব্যয়টি আসলে প্রশ্নবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে কোন জাজ্বল্যমান ও প্রকাশ্য বিষয়কে প্রশ্নের আকারে ব্যক্ত করা যায়, যাতে তার প্রকাশ্যতা আরও জোরদার হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই জিজ্ঞাসা করবে, সে এই উত্তরই দেবে, অপর কোন সম্ভাবনাই নেই। উদাহরণত কেউ দুপুরের সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করে---এখন কি দিন নয়? এটা দৃশ্যত প্রশ্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি যে একেবারে চরম জাজ্বল্যমান, তারই বর্ণনা। তাই এ ধরনের স্থানে কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, قد অব্যয়টি هل (বাস্তবিক নিশ্চয়তার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমনকি, আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। حين শব্দটিকে تنوين-সহ উল্লেখ করে সময়ের দীর্ঘতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত যে দীর্ঘ সময় মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে, তাতে তার কোন না পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। নতুবা মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে---একথা বলা দুরস্ত হয় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই দীর্ঘ সময়ের অর্থ মায়ের পেটে গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়, যা সাধারণত নয় মাস হয়ে থাকে। এতে মানব সৃষ্টির যত স্তর অতিবাহিত হয়---বীর্য থেকে দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,

প্রাণ সঞ্চার ইত্যাদি সব দাখিল আছে। এই সম্পূর্ণ সময়ে এক পর্যায়ে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সে ছেলে, না মেয়ে তা কেউ জানে না। এ সময়ে তার কোন নাম থাকে না এবং কোন আকার-আকৃতিও কেউ জানে না। ফলে কোথাও তার কোন আলোচনা পর্যন্ত হয় না। আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময়কে আরও বিস্তৃত অর্থ দেওয়া যেতে পারে। যে বীর্য থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা, সেই বীর্যও খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়। সেই খাদ্য এবং খাদ্যের পূর্ববর্তী উপকরণ কোন না কোন আকারে দুনিয়াতে ছিল। এই সময়কেও শামিল করলে আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময় হাজারো বছর হতে পারে। সার কথা, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দৃষ্টি এক নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। মানুষ যদি সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিরও অধিকারী হয় এবং এই তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে, তবে একদিকে তার নিজের স্বরূপ তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে এবং অপরদিকে স্রষ্টার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও অপার শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না। যদি একজন সত্তর বছর বয়স্ক ব্যক্তি ধ্যান করে যে, এখন থেকে একাত্তর বছর পূর্বে তার কোন নাম-নিশানা ছিল না, কোন ভঙ্গিতেই কেউ তার সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে পারত না, পিতামাতা ও দাদা-দাদীর মনেও তার বিশেষ অস্তিত্বের কোন আশংকা পর্যন্ত ছিল না, তখন কি বস্তু তার আবিষ্কার ও সৃষ্টির কারণ হয়েছে এবং কোন্ বিস্ময়কর অপার শক্তি সারা বিশ্বে বিস্তৃত কণাসমূহকে তার অস্তিত্বে একত্রিত করে তাকে একজন হুঁশিয়ার, জ্ঞানী, শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষে রূপান্তরিত করেছে, তবে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা বলতে বাধ্য হবে যে,

ما نبود یم و تقا ضا ما نبود — لطف تو نا گفتۂ ما می شنود

এরপর মানব সৃষ্টির সূচনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ——অর্থাৎ আমি মানুষকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। أمشاج শব্দটি مشج অথবা مشيج -এর বহুবচন। অর্থ মিশ্র। বলা বাহুল্য, এখানে নর ও নারীর মিশ্র বীর্য বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ তাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে امشاج বলে রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত---এই শারীরিক উপাদান চতুষ্টয় বোঝানো হয়েছে। এগুলো দিয়ে বীর্য গঠিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের উপাদান ও কণা শামিল আছে ঃ চিন্তা করলে দেখা যায় উপরোক্ত শারীরিক উপাদান চতুষ্টয়ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে অর্জিত হয়। প্রত্যেক মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেও দেখা যায় এতে দূর-দূরান্ত দেশ ও ভূখণ্ডের উপাদান পানি, বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে শামিল হয়। এভাবে একজন মানুষের বর্তমান শরীর বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, এটা এমন উপাদান ও কণাসমূহের সমষ্টি, যা বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্ত ছিল। সর্বশক্তিমানের অভাবনীয় ব্যবস্থা সেগুলোকে

বিস্ময়করভাবে তার শরীরে একত্রিত করেছে। امشاج-এর এই শেষোক্ত অর্থ অনুযায়ী এর দ্বারা কিয়ামত-অবিশ্বাসীদের সর্ববৃহৎ সন্দেহের অবসানও হয়ে যায়। কেননা, এই নিরীশ্বরবাদীদের মতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পথে সর্ববৃহৎ অন্তরায় এটাই যে, মানুষ মরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়, এরপর তা ধূলিকণা হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এসব কণাকে পুনরায় একত্র করা এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করা তাদের মতে যেন একেবারে অসম্ভব।

امشاج-এর তফসীরে তাদের এই সন্দেহের সুস্পষ্ট জওয়াব রয়েছে। কারণ, মানুষের প্রথম সৃষ্টিতেও তো সারা বিশ্বের উপাদান ও কণাসমূহ শামিল ছিল। এই প্রথম সৃষ্টি যার জন্য কঠিন হল না, পুনর্বার সৃষ্টি তার জন্য কঠিন হবে কেন?

نَبْتَلِيهِ—এটা ابتلاء থেকে উদ্ভূত। অর্থ পরীক্ষা করা। এই বাক্যে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে এ ভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা, পরের আয়াতে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমি পয়গম্বর ও ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই পথ জান্নাতের দিকে এবং এই পথ জাহান্নামের দিকে যায়। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি, যে কোন পথ অবলম্বন করার। সে মতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا—অর্থাৎ একদল তো তাদের স্রষ্টা ও নিয়ামতদাতাকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু অপরদল অকৃতজ্ঞ হয়ে কাফির হয়ে গেছে। অতঃপর উভয়-দলের প্রতিফল ও পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য রয়েছে শিকল, বেড়ী ও জাহান্নাম। আর ঈমান ও ইবাদত পালনকারীদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত নিয়ামত। সর্ব প্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেওয়া হবে, যাতে কাফূরের মিশ্রণ থাকবে। কোন কোন তফসীরকারক বলেনঃ কাফূর জান্নাতের একটি ঝরনার নাম। এই শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্য তাতে এই ঝরনার পানি মিলানো হবে। যদি কাফূরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেওয়া হয়, তবে জরুরী নয় যে, জান্নাতের কাফূর দুনিয়ার কাফূরের ন্যায় অখাদ্য হবে। বরং সেই কাফূরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ—عينا শব্দটি كافورا-এর بدل ও হতে পারে। এমতাবস্থায় এটা নির্দিষ্ট যে, আয়াতে কাফূর বলে জান্নাতের ঝরনাই বোঝানো হয়েছে। عباد الله বলে আল্লাহ্‌র সে সব নেক বান্দাকেই বোঝানো হয়েছে, ইতিপূর্বে যাদেরকে ابرار বলা হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি عينا শব্দটি من كأس-এর بدل হয়, তবে এটা অন্য কোন ঝরনা ও পানির বর্ণনা হবে। এমতাবস্থায় عباد الله-এর অর্থ হবে ابرار থেকে নিম্নস্তরের অন্য কোন দল।

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ—এতে বিধৃত হয়েছে যে, সৎ কর্মশীল বান্দাগণকে এসব নিয়ামত কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। نذر-এর শাব্দিক অর্থ নিজের জন্য এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেওয়া, যা শরীয়তের তরফ থেকে তার দায়িত্বে ওয়াজিব নয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। এর বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। এখানে মানত পূর্ণ করাকে জান্নাতীদের মহান প্রতিদান ও অফুরন্ত নিয়ামত লাভের কারণে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা যখন নিজেদের ওয়াজিব করা বিষয় পালনে যত্নবান, তখন যে সব ফরয-ওয়াজিব কর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো পালনে আরও উত্তমরূপে যত্নবান হবে। এভাবে মানত পূর্ণ করার মধ্যে সকল ওয়াজিব ও ফরয কর্ম পালনের বিষয় শামিল হয়ে গেছে। ফলে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ লাভের পূর্ণ কারণ হবে পূর্ণ আনুগত্য এবং ফরয ও ওয়াজিব কর্মসমূহ সম্পাদন। তবে মানত পূর্ণ করা যে ওয়াজিব ও গুরুত্বপূর্ণ, তা এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

মাস'আলা ঃ কায়েকটি শর্তসাপেক্ষে মানত হয়ে থাকে ১. যে কাজের মানত করা হয়, তা জায়েয ও হালাল হওয়া চাই এবং গোনাহ্ না হওয়া চাই। কেউ কোন নাজায়েয কাজের মানত করলে তা পূর্ণ না করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা আদায় করতে হবে। ২. কাজটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওয়াজিব না হওয়া চাই। সেমতে কোন ব্যক্তি ফরয নামায অথবা ওয়াজিব বেতেরের মানত করলে তা মানত হবে না।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে আরও একটি শর্ত এই যে, যেসব ইবাদত শরীয়তে ওয়াজিব করা হয়েছে, সেই জাতীয় কাজের মানত করতে হবে, যেমন নামায-রোযা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। যে জাতীয় কাজের কোন ইবাদত শরীয়তে উদ্দিষ্ট নয়, সেই জাতীয় কোন মানত করলে তা পূর্ণ করা জরুরী হয় না; যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া অথবা জানাযার পশ্চাৎগমন ইত্যাদি। এগুলো ইবাদত হলেও উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا—অর্থাৎ জান্নাতীদের এসব নিয়ামত একারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করত। عَلَىٰ حُبِّهِ-এর মর্মার্থ এই যে, তারা শুধু নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্যই দরিদ্রদেরকে দান করে না বরং নিজেদের প্রয়োজন সত্ত্বেও দান করে। দরিদ্র ও ইয়াতীমদেরকে আহার্য দেওয়া যে ইবাদত, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। বন্দী বলে এমন বন্দী বোঝানো হয়েছে, যাকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী বন্দী করা হয়েছে—সে কাফির হোক অথবা মুসলমান অপরাধী। বন্দীকে খাওয়ানো ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

কেউ বন্দীকে আহার্য দিলে সে যেন সরকার ও বায়তুল মালকে সাহায্য করে। তাই বন্দী কাফির হলেও তাকে খাওয়ানো সওয়াবের কাজ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বন্দীদেরকে খাওয়ানো ও তাদের হিফাযতের দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানদের উপর বণ্টন করে অর্পণ করা হত। বদর যুদ্ধের বন্দীদের বেলায় তাই করা হয়েছিল।

قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ——দুনিয়ার রৌপ্য-পাত্র ঘাড় মোটা হয়ে থাকে—আয়নার মত স্বচ্ছ হয় না। পক্ষান্তরে কাঁচ নির্মিত পাত্র রৌপ্যের মত শুভ্র হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কিন্তু জান্নাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আয়নার মত স্বচ্ছ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ জান্নাতের সব বস্তুর নযীর দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নির্মিত গ্লাস ও পাত্র জান্নাতের পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ নয়।

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا—زنجبيل-এর প্রসিদ্ধ অর্থ শুঁঠ। আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই জান্নাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ জান্নাতের বস্তু ও দুনিয়ার বস্তু নামেই কেবল অভিন্ন। বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাই দুনিয়ার শুঁঠের আলোকে জান্নাতের শুঁঠকে বোঝার উপায় নেই।

وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ—سوار শব্দটি اسا ور-এর বহুবচন। অর্থ কংকন, যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই আয়াতে রূপার কংকন এবং অন্য এক আয়াতে স্বর্ণের কংকন উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা, কোন সময় রূপার এবং কোন সময় স্বর্ণের কংকন ব্যবহৃত হতে পারে অথবা কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এখানে কথা থাকে এই যে, কংকন নারীদের ব্যবহারের অলংকার। পুরুষদের জন্য এরূপ অলংকার পরিধান করা সাধারণত দূষণীয়। জওয়াব এই যে, কোন অলংকার নারীদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া এবং পুরুষদের জন্য দূষণীয় হওয়া—এটা সর্বতোভাবে প্রচলন ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন দেশে অথবা জাতিতে যে জিনিস দূষণীয়, অন্য জাতিতে তাই পছন্দনীয় হয়ে থাকে। পারস্য সম্রাটগণ হাতে কংকন পরিধান করতেন এবং বুকে ও মুকুটে অলংকারাদি ব্যবহার করতেন। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য ও সম্মানরূপে গণ্য হত। পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হওয়ার পর সম্রাটদের যে ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাতে রাজকীয় কংকনও ছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সামান্য ভৌগোলিক ও জাতিগত তফাতের কারণে যখন এরূপ হতে পারে, তখন জান্নাতকে দুনিয়ার আলোকে দেখার কোন মানে থাকতে পারে না। জান্নাতে অলংকারাদি পুরুষদের জন্যও উত্তম বিবেচিত হবে।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا—অর্থাৎ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে পৌঁছে যাবে, তখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বলা হবেঃ জান্নাতের এসব বিস্ময়কর

অবদানসমূহ তোমাদের দুনিয়াতে কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টা আল্লাহ্‌র কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব বাক্য মোবারকবাদ হিসাবে বলা হবে। আশেক ও প্রেমিকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, জান্নাতের সব নিয়ামত একদিকে এবং রব্বুল আলামীনের এই উক্তি একদিকে; নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কারণ, এতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টির সনদ বিতরণ করছেন। সাধারণ জান্নাতীদের নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করার পর অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ নিয়ামত হচ্ছে কোরআন অবতরণ। এই মহান নিয়ামত উল্লেখ করার পর প্রথমে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধী কাফিররা যে অস্বীকার, হঠকারিতা ও নানাভাবে আপনাকে হয়রানি করে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন। এছাড়া দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকুন। এর মাধ্যমেই কাফিরদের হয়রানিরও অবসান হবে।

পরিশেষে কাফিরদের হঠকারিতার এই কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই মূর্খরা পার্থিব ধ্বংসশীল ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পরিণাম অর্থাৎ পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। অথচ আমি দুনিয়াতেও খোদ তাদের অস্তিত্বে এমন উপকরণ রেখেছিলাম, যে সম্পর্কে চিন্তা করলে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারত। বলা হয়েছে ঃ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ—অর্থাৎ আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন প্রকৃতি মজবুত ও সুদৃঢ় করেছি।

মানবদেহের গ্রন্থিতে কুদরতের অপূর্ব লীলা ঃ এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ তার এক এক গ্রন্থি সম্পর্কে ভেবে দেখুক। উপযোগিতা ও আরামের খাতিরে দৃশ্যত এগুলো নরম ও নাজুক মনে হয় এবং নরম নরম মাংসপেশী দ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত আছে। ফলে স্বভাবত এক-দুই বছরেই গ্রন্থির এই বন্ধন ও মাংসপেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কথা ছিল; বিশেষত যখন এগুলো সারাক্ষণ নড়াচড়া এবং বাঁকানো মোড়ানোর মধ্যেই থাকে। এভাবে দিবারাত্র নড়াচড়ার মধ্যে থাকলে তো লোহার স্প্রিংও এক-দুই বছরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এসব নরম ও নাজুক মাংসপেশী কিভাবে দেহের গ্রন্থিসমূহকে বেঁধে রেখেছে! এগুলো না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না ভেঙ্গে যায়। হাতের অঙ্গুলীর গ্রন্থিগুলোই দেখুন এবং হিসাব করুন, সারা জীবনে এরা কতবার নড়াচড়া করেছে এবং কেমন কেমন জোর ও চাপ এদের উপর পড়েছে। ইস্পাতের তৈরী হলেও এত দিনে ক্ষয় হয়ে যেত। কিন্তু সত্তর-আশি বছর চালু থাকার পরও এগুলো সগর্বে অক্ষত আছে।

سورة المرسلات

সূরা মুরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৫০ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝١ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝٢ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝٣
فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝٤ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝٥ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝٦
اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝٧ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝٨ وَاِذَا السَّمَآءُ
فُرِجَتْ ۝٩ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١٠ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝١١ لِاَيِّ يَوْمٍ
اُجِّلَتْ ۝١٢ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝١٣ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝١٤
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٥ اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٦ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ
الْاٰخِرِيْنَ ۝١٧ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝١٨ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٩ اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٢٠ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ
قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝٢١ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٢٢ فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ۝٢٣
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٢٤ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۝٢٥
اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۝٢٦ وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً
فُرَاتًا ۝٢٧ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٢٨ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ
بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝٢٩ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۝٣٠ لَّا ظَلِيْلٍ
وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ۝٣١ اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۝٣٢

كَأَنَّهُ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾ هٰذَا يَوْمُ لَا
يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾ هٰذَا
يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ
فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ
وَّعُيُوْنٍ ﴿٤١﴾ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾ كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا
لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَبِاَيِّ
حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) কল্যাণের জন্য প্রেরিত বায়ুর শপথ, (২) সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, (৩) মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ, (৪) মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং (৫) ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাগণের শপথ---(৬) ওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্য অথবা সতর্ক করার জন্য (৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। (৮) অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হবে, (৯) যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে, (১০) যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং (১১) যখন রসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরূপিত হবে, (১২) এসব বিষয় কোন্ দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে? (১৩) বিচার দিবসের জন্য (১৪) আপনি জানেন বিচার দিবস কি? (১৫) সেদিন মিথ্যারোপ-কারীদের দুর্ভোগ হবে। (১৬) আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? (১৭) অতঃপর তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করব পরবর্তীদেরকে। (১৮) অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। (১৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (২০) আমি কি তোমা-দেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? (২১) অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত আধারে, (২২) এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, (২৩) অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি, আমি কত সক্ষম স্রষ্টা? (২৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

(২৫) আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে, (২৬) জীবিত ও মৃতদেরকে? (২৭) আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা এবং পান করিয়েছি তোমাদেরকে তৃষ্ণা নিবারণকারী সুপেয় পানি। (২৮) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে! (২৯) চল তোমরা তারই দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (৩০) চল তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, (৩১) যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। (৩২) এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করবে (৩৩) যেন সে পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী। (৩৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৫) এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না (৩৬) এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেওয়া হবে না। (৩৭) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৮) এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্র করেছি। (৩৯) অতএব তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে। (৪০) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪১) নিশ্চয় আল্লাহ্ ভীরুরা থাকবে ছায়ায় এবং প্রস্রবণসমূহে---(৪২) এবং তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের মধ্যে। (৪৩) বলা হবে ঃ তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। (৪৪) এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৪৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪৬) কাফিরগণ, তোমরা কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও। তোমরা তো অপরাধী। (৪৭) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন তারা নত হয় না। (৪৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৫০) এখন কোন্ কথায় তারা এরপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কল্যাণের জন্য প্রেরিত বায়ুর শপথ, সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, (যাতে বিপদাশংকা থাকে) মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ (যার পরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়) মেঘপুঞ্জকে বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর শপথ (বৃষ্টির পর এরূপ হয়ে থাকে) এবং সেই বায়ুর শপথ যে, (অন্তরে) আল্লাহ্র স্মরণ অর্থাৎ (তওবা অথবা সতর্কবাণী) জাগরিত করে। (অর্থাৎ উপরোক্ত বায়ুসমূহ আল্লাহ্র অপার কুদরত জ্ঞাপন করার কারণে আল্লাহ্র দিকে মনোযোগী হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। এই মনোযোগ দ্বিবিধ হয়ে থাকে---(১) এ সব বায়ু ভীতিপ্রদ হলে ভয় সহকারে এবং (২) তওবা ওযরখাহী সহকারে। এটা ভয় ও আশা উভয় অবস্থাতে হতে পারে। বায়ু কল্যাণবাহী হলে আল্লাহ্র নিয়ামত স্মরণ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং নিজ ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়ে। পক্ষান্তরে বায়ু ভয়াবহ হলে আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করে গোনাহের জন্য তওবা করা হয়। অতঃপর শপথের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে) তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে। এসব শপথ কিয়ামতের খুবই উপযুক্ত। কেননা, প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার পর বিশ্বজগতের ধ্বংসপ্রাপ্তির ঘটনা ঝঞ্ঝাবায়ুর সমতুল্য এবং দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার পরবর্তী ঘটনাবলী তথা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়া ইত্যাদি কল্যাণবাহী বায়ুর

সাথে সামঞ্জস্যশীল, যদ্দ্বারা বৃষ্টি এবং বৃষ্টি দ্বারা উদ্ভিদের মধ্যে জীবন সঞ্চারিত হয়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ) অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন পর্বতমালা উড়তে থাকবে এবং যখন রসূলগণকে নির্দিষ্ট সময়ে একত্র করা হবে, (তখন সবার বিচার হবে। অতঃপর সেই দিবসের ভয়াবহতা উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু জানা আছে কি) পয়গম্বরগণের ব্যাপার কোন্ দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে) বিচার দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। এই প্রশ্ন ও উত্তরের উদ্দেশ্য এরূপ মনে হয় যে, কাফিররা সবসময়ই রসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে। এখনও তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিথ্যারোপ করছে। তাদেরকে এ বিষয়ে পরকালের ভয় প্রদর্শন করা হলে তারা পরকালকেও অস্বীকার করে। এই মিথ্যারোপের ব্যাপারটি অনতিবিলম্বেই চুকিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, একে স্থগিত রাখার ফলে কাফিররা আরও অস্বীকার ও মিথ্যারোপের সুযোগ পায়। মুসলমানরাও এব্যাপারটি দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার বাসনা পোষণ করে। সুতরাং আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন রহস্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা একে স্থগিত রেখেছেন কিন্তু একদিন না একদিন অবশ্যই এই বিচার সংঘটিত হবে)। আপনি জানেন সেই বিচারের দিবস কেমন? (অর্থাৎ খুবই কঠিন। যারা এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, তাদের বোঝা উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর অতীত ইতিহাসের মাধ্যমে বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে)। আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করিনি? অতঃপর তাদের পশ্চাতে পরবর্তীদেরকেও (আযাবে) একত্র করব। (অর্থাৎ আপনার উম্মতের কাফিরদের উপরও ধ্বংসের শাস্তি নাযিল করব। বদর, ওহুদ ইত্যাদি যুদ্ধে তাই হয়েছে। অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। অর্থাৎ কুফরের শাস্তি দেই---উভয় জাহানে কিংবা পরকালে। যারা কুফরের কারণে আযাবের

যোগ্য হওয়াকে মিথ্যা মনে করে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা ও মৃতদের পুনরুজ্জীবনকে আরও ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (অর্থাৎ বীর্য) থেকে সৃষ্টি করিনি? (অর্থাৎ প্রথমে তোমরা বীর্য ছিলে)। অতঃপর আমি তা এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখেছি সংরক্ষিত আধারে (অর্থাৎ নারীর গর্ভাশয়ে)। অতঃপর আমি (এ সব কাজের) এক পরিমাণ নির্ধারণ করেছি। আমি কত উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী! (এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ মৃতদেরকে পুনর্বার জীবিত করতে সক্ষম। সুতরাং যারা এই সত্যকে অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতাকে মিথ্যারোপ করে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর আনুগত্য ও ঈমানে উৎসাহিত করার জন্য কতক নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে) আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃতদেরকে ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করিনি? (জীবন এর উপরই অতিবাহিত হয়। মৃত্যুর পর দাফন, নিমজ্জিত ও প্রজ্বলিত হওয়ার পথে অবশেষে মানুষ মাটির সাথেই মিশে যায়। মৃত্যুর পরও ভূমি নিয়ামত। কেননা, মৃতরা মাটি না হয়ে গেলে জীবিতদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যেত, তারা পৃথিবীতে বসবাস এমনকি, চলাফেরা করার জায়গা পেত না)। আমি তাতে (অর্থাৎ ভূমিতে) স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা (যদ্দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হয়)। এবং